পরাশর এবার জহুরী

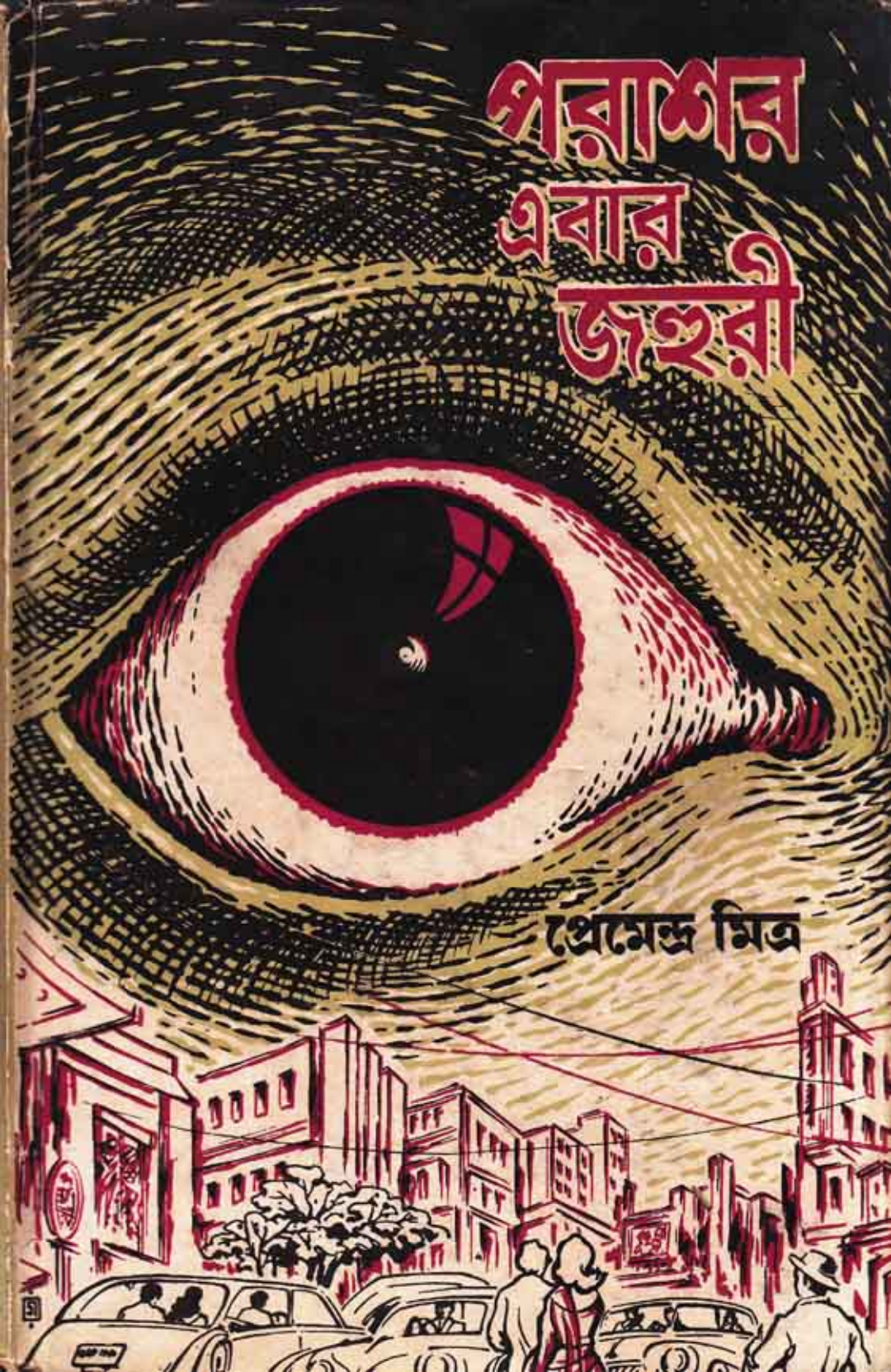

প্রেমেন্দ্র মিত্র

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.03.01 02:26:27 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

ট্যাক্সিতে অনেক সময়ে গোলমাল করে। ওয়েটিং চার্জ দিলেও দাঁড়াতে চায় না। তাই বেশ একটু বেশী খরচ করে প্রাইভেট একটা গাড়িই সারাদিনের জন্যে ভাড়া করেছিলাম।

গাড়িটা স্ট্যাণ্ডে রেখে ড্রাইভারকে একেবারে সারাক্ষণ তৈরী থাকবার নির্দেশ দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম চোখ কান যতদূর সম্ভব সজাগ রেখে।

জায়গাটা চৌরঙ্গীর মোড়। সময় বেলা দুটো, আমার সামনে পূব দিকে রাস্তার ওপারে মেট্রো সিনেমা, পেছনে পশ্চিমে আগেকার কার্জন পার্ক দু'ভাগ করা ট্রামলাইনের এসপ্লানেড জংশন।

বেলা সাড়ে বারোটা থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। নজরটা প্রধানতঃ পুবের রাস্তা আর ওপারের ফুটপাথের ওপরই রেখেছি। তবু ডাইনে বাঁয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোড আর ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ের দিকটা একেবারে অবহেলা করি নি।

মুস্কিল হয়েছে অতক্ষণ এক জায়গাতেই ঘুরে ফিরে বেড়ানোটাকে স্বাভাবিক চেহারা দেওয়া।

অনেক রকম ফিকিরই তার জন্যে করতে হয়েছে। কখনো যেন রাস্তা পার হতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছি। সস্তায় ফাউণ্টেন বিক্রীর আসল ঘাঁটি রাস্তার ওপারে। তবু দু'একজন ফিরিওয়ালা সহজ শিকারের খোঁজে এক আবার এদিকটাতেও টহল দিয়ে যায়। তাদেরই একজন পাশ দিয়ে যেতে যেতে খুব গোপন খবর দেবার মত চাপাগলায় বলে গেছে, আসল পার্কার ষাট বাবু, সলিড গোল্ড। স্মাগ্‌লড মাল, সস্তায় পাবেন। খানিকদূর

www.boiRboi.blogspot.com

চলে যাবার পর সময় কাটাবার ছুতোর সন্ধান করে তাকেও পিছন থেকে ডেকেছি। সস্তায় স্মাগ্‌ল্‌ড মালের স্বরূপ জানা সত্ত্বেও অনাড়ির মত তার সঙ্গে দরদস্তুর করেছি বেশ খানিকক্ষণ ধরে। দরাদরি করতে করতে সামনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাটা তার কাছেও ঠিক গোপন রাখতে পারি নি। ফেরিওয়ালা সেটা আমার পুলিশ সম্বন্ধে শঙ্কিত সাবধানতা বলে ধরে নিয়েছে বলেই রক্ষে। লোভের সঙ্গে আমার ভয়টাকেও আরো উস্কে দেবার চেষ্টা করে সে গম্ভীর চাপাগলায় বলেছে,—তাড়াতাড়ি করুন স্যার। দেড়শ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় ছাড়ছি, আর কি চান? কখন কোথা দিয়ে কে হানা দেবে তার ত ঠিক নেই। শাদা পোশাকে সব ঘুরছে। দেখে চিনতেও পারবেন না। নিন স্যার যা বলবার বলে ফেলুন।

কিছুক্ষণ সময় কাটাবার ফন্দিটা সফলভাবে খাটিয়ে ফেরিওয়ালাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করেছি তারপর। তাড়াতাড়ি যাতে কেটে পড়ে তার জন্যে দেড়শ টাকার স্মাগ্‌ল্‌ড মালের দাঁও মারা দাম পঞ্চাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছি পাঁচে। গালাগাল না হোক একটা কান লাল করবার মত জবারের জন্যেই প্রস্তুত ছিলাম। তার বদলে হ্যাঁ—তার বদলে পকেট থেকে করকরে একটি পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়ে সেই রাঙতামোড়া অমূল্য স্মাগ্‌ল্‌ড মালটি গ্রহণ করতে হয়েছে। ভদ্রলোকের কথার খেলাপ করবার সুযোগ ফেরিওয়ালা আমায় দেয় নি।

এক দাঁও-এ একেবারে একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা লাভ করার ধাক্কা সামলাতে খানিকক্ষণ গেছে। কোনো কিছু কিন্তু তখনও ঘটে নি। পুরানো 'হোয়াইট ওয়ে লেডল' বাড়ির গম্বুজ ঘড়িতে দুটো বাজার পর একটু অস্থির ও চিন্তিত হয়েছি।

সত্যিই লক্ষ্য রাখবার মত কিছু ঘটে নি, না, আমারই সজাগ পাহারার ত্রুটি?

ইঙ্গিত যা পেয়েছিলাম তাতে বেলা দুটোর মধ্যেই ত কিছু না কিছু হবার কথা।

তাহলে এবার কি আমার রণে ক্ষান্ত হওয়াই উচিত ?

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আর খানিক এদিক-ওদিকে পায়চারী করলাম।

ঘড়ির বড় কাঁটাটা পাঁচ ছাড়িয়ে দশের দাগে গিয়ে পৌঁছেছে। আর মিথ্যে টহল দেবার কোনো মানে হয় না। দুনিয়াটা সত্যিই গোয়েন্দা গল্পের স্বর্গ নয়, যে থেকে থেকে যেখানে-সেখানে রোমাঞ্চের শিহরণ লাগাবার তোড়জোড় চলেছে।

ভাবনাটা মনে ভেসে উঠতে না উঠতেই শরীরটায় শিহরণের ঢেউ খেলে গেল।

ওই ত, যার জন্যে এই উদ্বিগ্ন অপেক্ষা, ওপারে মেট্রো সিনেমার সামনেই সে দাঁড়িয়ে। কেমন একটু উদ্ভ্রান্ত অস্থির ভাব সত্যিই।

ভাড়াটে গাড়ির ড্রাইভারকে শেষ নির্দেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হবার জন্যে পূব দিকের সীমানার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পথের ধারে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকের চৌরঙ্গী সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ের ট্রাফিক ছেড়ে দিয়েছে। স্রোত বইছে বাস, লরী মোটরের। এর ভেতরে দিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব।

এত কষ্টের শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না কি এই সুযোগে ?

না, এদিক-ওদিক চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করে মেট্রোর ভেতরে টিকিটের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডান দিকের অ্যাডভান্স টিকিটের কাউন্টার। সেখান একটু দেরী হবে নিশ্চয়। তার মধ্যে রাস্তা পার হয়ে যাব। আর তা না পারলেও এপার থেকে লক্ষ্য রাখতে পারব ঠিকই।

একবার দেখলে ও চেহারার ওপর নজর রাখার বিশেষ অসুবিধে নেই। দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত কেউ নয়। দূর থকেই চেহারার বিশেষত্বটা মনে একেবারে ছাপ দিয়ে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

সুন্দরী বলতে যা সাধারণতঃ বোঝায় তা হয়ত নয়, কিন্তু পাৎলা একহারা দেহের সাবলীল স্বচ্ছন্দ চলায় ফেরায় যেন যৌবনের অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ বিকীরিত হচ্ছে মনে হয়।

এবার উত্তর-দক্ষিণের ট্রাফিক থামায়, এপার থেকে ওপারে যাবার সুযোগ পেলাম। ঠিক সামনেই পেয়েছি। মেয়েটি কাউন্টার থেকে কাজ সেরে এসে বাঁয়ে ঘুরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। হাঁটার গতিছন্দটি চমৎকার কিন্তু এখনো যেন একটা দ্বিধান্বিত ভাব অছে। যেতে যেতে দুবার থামল। একবার হঠাৎ পিছু ফিরে তাকাল।

সন্দেহ কিছু করেছে নাকি? সন্দেহ করলেও আমায় বিশেষ-ভাবে করা অসম্ভব। চৌরঙ্গীর ডান দিকের ফুটপাথে ধর্মতলা থেকে সেই লিণ্ডসে স্ট্রীট পর্যন্ত সারাক্ষণ জনস্রোত বইছে দুমুখো। তার মধ্যে বিশেষ কেউ পিছু নিয়েছে বলে চেনবার কোনো সুযোগই তরুণীকে দিই নি। আমি জনস্রোতের একটা কুটি মাত্র। মেয়েটি আমার সম্পূর্ণ অচেনা, আমাকেও সে কস্মিনকালে দেখে নি। আমার সঙ্গে আর দশজনের কোনো তফাৎ বোঝা তার পক্ষে অসম্ভব।

পিছন ফিরে তাকালেও মেয়েটির দৃষ্টি বিশেষ কাউকে খুঁজছে বলে মনে হল না। ফিরে চাওয়াটা নেহাৎ অভ্যাসমাফিক সাবধানতার একটা ভঙ্গি।

কিন্তু একি! মেয়েটি যে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

মেট্রো পার হয়ে একটা রেস্তোরাঁ তারপর হোয়াইটওয়ে বিল্ডিংস আরম্ভ। ফুটপাথের বাঁ ধারে বড় বড় কাঁচ দেওয়া শো-উইনডো। বহুকাল আগে হোয়াইটওয়ে লেডল-র সাহেবী খানদানি দোকানের রকমারী পোশাক আসাক সওদা সাজানো থাকত। কাঁচের জানালার ওধারে নতুন পোশাক পরা মেমের মূর্তি দেখতে ভিড় জমে যেত পথচারীর।

www.boiRboi.blogspot.com

এখনও ভিড় একটু-আধটু জমে। যা জমে, তা কাঁচের শো-কেসে মার্কিন মুলুকের প্রচারচিত্র দেখবার জন্যে।

মেয়েটি ফুটপাথ থেকে সরে এই শো-উইনডোগুলিই যেন অন্যমনস্কভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। হঠাৎ এরকম ঝট করে বাঁদিকে চোখের আড়ালে যে চলে যাবে তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝাই যায় নি। সমস্ত ব্যাপারটা রজ্জুতে হয়ত সর্প ভ্রম বলে মনে একটু যে সন্দেহ জাগছিল মেয়েটির এ ব্যবহারে তা একেবারে মুছে গেল। গভীর কিছু রহস্য এর মধ্যে আছেই।

কিন্তু বাঁ দিকে চোখের আড়ালে মেয়েটি যাবে কোথায়? বাঁ দিকে নিচের তলায় একটিমাত্র যাবার জায়গা। ইউ-এস-আই-এস-এর অফিস। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসের কাঁচের স্প্রিং দেওয়া দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়। কিন্তু ঢুকলেই ত যেখানে খুশি যাওয়া যায় না। সামনে রিসেপসনিস্ট আছে। চেনা কারুর কাছে গেলেও তাকে একবার জানিয়ে যেতে হয়।

এ ছাড়া আর একমাত্র যাবার রাস্তা চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে। ওপরে এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর আরো কি সব ব্যাঙ্ক ইত্যাদির অফিস আছে। সেখানে গিয়েই বা লুকোবে কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল দোতলার একেবারে পূব-দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের সিঁড়ি আছে সুরেন ব্যানার্জি স্ট্রীটে গিয়ে নামবার। একটা লিফ্‌টও আছে সেখানে। বেশীর ভাগই যদিও অচল।

সেই পথ দিয়ে যদি নেমে চলে যায়?

সন্দেহ জাগার পর ব্যস্ত হয়ে ভিড় ঠেলে এগুতে গিয়ে প্রায় ঝগড়াঝাটি বাধিয়ে বাড়িটার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ কোণ থেকে সুরেন ব্যানার্জি রোডের আর চৌরঙ্গীর দুদিকের গেটেই লক্ষ্য রাখা যায়। এ দুটি ছাড়া বার হবার রাস্তা নেই। সুতরাং যেদিক দিয়েই বার হোক আমার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

এই কোণটায় স্বাভাবিকভাবে পাহারায় থাকবার সুবিধেও আছে কিছু। ফুটপাথের ধারে ধারে ফাউণ্টেন পেন চশমার কাঁচ, ছেলেদের খেলনা পাতি জামা শোয়েটার থেকে সস্তা জাপানী দূরবীনের পসরা সাজিয়ে বসেছে ফড়েরা। সস্তা দূরবীন কেনার ছল করে দাঁড়ানোটাই সুবিধের মনে হল। দূরবীন চোখে নিয়ে একবার এদিক আর একবার ওদিকে নজর রাখলাম।

ছলটা মন্দ নয় কিন্তু রহস্যময়ী তরুণী যদি বার হয়ে আসতে খুব বেশী দেরী করেন তাহলে দূরবীন ছেড়ে আর কিছু সওদায় মনোযোগ দিতে হবে। অন্য সওদার বেলা মুস্কিল এই যে তা পরীক্ষা করার ভান করতে করতে ঘন ঘন এদিক ওদিক চাওয়াটা সন্দেহজনক মনে হতে পারে।

ভাগ্য আমার ভালো। মেয়েটির অপেক্ষায় বেশীক্ষণ দূরবীন কেনার ভান করতে হল না। দূরবীন চোখে দিয়েই তাকে দক্ষিণ-পূবের সিঁড়ির গেট দিয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোডে বার হতে দেখলাম।

দূরবীনটা চোখে থাকায় লাভ হল একটা। সস্তা খেলনা-দূরবীন হলেও চৌরঙ্গীর মোড় থেকে ইউ-এস-আই-এস-এর লাইব্রেরী ছাড়িয়ে গেটটুকু পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েটির মুখটা এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

না, শুধু দেহসৌষ্ঠবই নয় মেয়েটির মুখের সৌন্দর্যও আছে। সৌন্দর্যটা একটু উগ্র-কঠিন ধরণের। লালিত্যের একটু অভাব আছে।

রূপ বিশ্লেষণের অবশ্য তখন সময় নয়। দূরবীনের ভেতর দিয়ে মেয়েটিকে ফুটপাথ ধরে পূবদিকে হাঁটতে দেখে তাড়াতাড়িতে দূরবীনটা হাতে করেই সেদিকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলাম।

ফেরিওয়ালার ডাকে থামতে হল।

কি বাবু! মালটা মুফৎ নিয়ে যাচ্ছেন যে!

www.boiRboi.blogspot.com

ফেরিওয়ালাদের সাধারণত বেশ সাধা গলাই হয় সওদার ঘোষণা হেঁকে হেঁকে। দূরবীনের ফেরিওয়ালা তাদের মধ্যেও বোধহয় কালোয়াত। তার চাঁছা গলার বিদ্রূপের খোঁচা একেবারে তীরের মত পিঠে এসে বিঁধল।

অপ্রস্তুত হয়ে থেমে পড়ে লজ্জার মাথায় দূরবীনটা আর ফেরৎ দিতে পারলাম না। যা দাম হাঁকলে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে ফেলে পেছন ফিরে সুরেন ব্যানার্জি রোডের দিকে চেয়ে চক্ষুস্থির।

যত দূর চাই নাই নাই সে পথিক, মানে পথিকা নাই।

সেই মুহূর্তে এ কবিতার কলি মাথায় অবশ্য আসে নি। যা এসেছে তা নিজের প্রতি ধিক্কার। চোখের ওপর থেকে এরকম শিকার ফস্কাতে দিলাম। এ আহাম্মকির জবাবদিহি দিতে যে মাথা কাটা যাবে।

আশা নেই তবু দূরবীনটা হাতে নিয়েই সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে সামনের দিকে প্রায় ছুট দিলাম।

একটিমাত্র সম্ভাবনার কথা তখন ভাবছি। সামনে এলিট সিনেমা আর করপোরেশন বিল্ডিং-এর শেষ পর্যন্ত দু ফুটপাথ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি সেদিক দিয়ে হাঁটলে নজর এড়াত না।

সুতরাং পুরনো অ্যালবিয়ন সিনেমার ধার দিয়ে যে রাস্তা মার্কেটের পশ্চিম থেকে এসে সুরেন ব্যানার্জি রোড পার হয়ে ধর্মতলার ষ্ট্রীটে গেছে সেই রাস্তাতেই মেয়েটি ডান দিকে বা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে।

কোন দিকে গেছে কিছুই অবশ্য জানি না। কিন্তু ভাগ্য একটু অনুগ্রহ করলে এখনই একেবারে হাল ছেড়ে দিতে হয়ত হবে না।

মোড়টায় পৌঁছে আকুলভাবে একবার ধর্মতলার আর একবার মার্কেটের দিকে তাকালাম।

না, ভাগ্যের দয়া আমার উপর নেই। দুদিকের রাস্তায় পথচারিণী সুন্দরী তরুণীর একেবারে অভাব না থাকলেও আমি যাকে খুঁজছি সে মেয়েটি নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

হতাশ হয়ে আবার পশ্চিম দিকেই ফিরলাম।

মোড়ের ট্র্যাফিক কণ্ট্রোলের দরুন একটু দেরী হলেও আমার নির্দেশ মত ভাড়াকরা গাড়িটা তখন সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢুকে আমার দিকেই আসছে।

আমার কাছে এসে গাড়িটা থামতে তাতে উঠে পড়তেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ চমকে উঠতে হল।

না, ভাগ্য একেবারে নির্মম নয়। সেই মেয়েটিই মার্কেটের দিক থেকে সুরেন ব্যানার্জি রোডের দিকেই আসছে। ঠিক মার্কেটের দিক থেকে নয় ডান দিকের যে রাস্তাটা একদিকে রক্সি সিনেমা আর একদিকে কেশোরামের ভ্যারাইটি স্টোর-এর মাঝখান দিয়ে চৌরঙ্গীতে গিয়ে পড়েছে সেই রাস্তাটা দিয়েই মেয়েটি এসেছে।

ওদিকে মেয়েটি কোথায় গেছল? রক্সিতে না ভ্যারাইটি স্টোরে?

যেখানেই গিয়ে থাকুক তা এখন গবেষণা করবার নয়। তার দেখা যে আবার পেয়েছি এই আমার কাছে কল্পনাতীত অঘটন। প্রাণ থাকতে আর তাকে নজর ছাড়া করছি না।

গাড়িটার কাছেই দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলবার ছলে মেয়েটির ওপর লক্ষ্য রাখলাম।

কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা কি? মেয়েটির গতিবিধি গভীর সন্দেহ জাগাবার মত নিশ্চয়ই কিন্তু সেই সঙ্গে তার মাথায় একটু ছিটও আছে নাকি!

পুরানো অ্যালবিয়ন এখানকার প্লাজার পাশ দিয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ সে থামল। পুলিশের হাত নাড়ায় উত্তর-দক্ষিণের

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়ি লরী থেমে পূব-পশ্চিমের যানবাহনের স্রোত তখন বইছে। পার হবার এ সুবিধে সত্ত্বেও মেয়েটি থামবার কারণ এবার সন্দেহ করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

মেয়েটি কি আমার অনুসরণ করা টের পেয়েছে নাকি?

কয়েক মুহূর্ত যেরকম তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাল তাতে সেরকম ধারণা হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি যা করল তাতে সন্দেহটা আরো দৃঢ়ই হল।

একটা খালি ট্যাক্সি পূব থেকে এসে দক্ষিণ দিকে তখন বাঁক নিয়েছে।

মেয়েটি হাত তুলে তাকে থামাল। তারপর প্রায় হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পার হয়ে করপোরেশন বিল্ডিং-এর দিকে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেই চালাবার নির্দেশ দিলে।

ভাগ্য সত্যিই ভাল বলে গাড়িটা অমন সময় মত পেয়েছিলাম। পূব-পশ্চিমের যানবাহনের প্রবাহ প্রায় তখন থামবার সময় হয়েছে। ড্রাইভারকে নম্বর নেওয়ার ঝক্কি নিয়েই দরকার হলে ট্যাফিক পুলিশের নির্দেশ ও অমান্য করে ডান দিকে ঘুরে ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করতে বললাম।

ড্রাইভার সত্যিই তুখোড়। পুলিশের ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো স্রোতের নির্দেশ হাত তোলার টায় টায় মুহূর্তের মধ্যে ডান দিকে বাঁক নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

ট্যাক্সিটা তখন সোজা মার্কেটের পশ্চিম গা ধরে লিণ্ডসে স্ট্রীটের দিকে চলেছে।

লিণ্ডসে স্ট্রীটে ট্র্যাফিক-এর বাধা পেয়ে অনেক গাড়ি আটক আছে। মেয়েটির ট্যাক্সিটাও তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইচ্ছে করলে অনায়াসে তখন তার একবারে কাছে আমার গাড়ি দাঁড় করানো যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

তা করলে চলবে না। একটু পিছিয়ে থাকবার জন্যে আস্তে চালাতে হবে।

ড্রাইভারকে সে নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলাম। তার দরকার হল না। সত্যিই পাকা লোক। নিজে থেকেই লাইট হাউস-এর বাঁকটায় পৌঁছোবার আগেই গাড়ির গতি সে কমিয়ে নিলে।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের বাধাটা সরে যেতে দেখলাম। মেয়েটির ট্যাক্সি লিণ্ডসে স্ট্রীটের ডান দিকে মোড় নিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে চলল।

একটু দুর্ভাবনায় আছি তখন। মেয়েটি আমার গাড়ির চেহারা ও নম্বর তখন লক্ষ্য করেছে সন্দেহ নেই। এখন একবার গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনে তাকালেই আমার গাড়ি দেখতে পাবে।

মেয়েটিকে পিছু ফিরতে কিন্তু দেখলাম না।

অমন মোক্ষম সময়ে ট্যাক্সি পেয়ে সরে পড়তে পারায় নিজেকে সে অনুসরণের অতীত নিরাপদ মনে করছে বোধহয়।

সামনে আবার চৌরঙ্গী রোডের বাধা। আগের গাড়িগুলো দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। ট্যাফিক সিগ্‌ন্যালের সবুজ আলোটা এখানো জ্বলছে। মেয়েটির ট্যাক্সি তার সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে গেল। আমার গাড়ির সামনে কিন্তু আরো সাত-আটটি গাড়ি রয়েছে। সেগুলি পার হবার পরও সবুজ প্রসন্নতা থাকবে কি না সন্দেহ।

যা ভয় করেছিলাম তাই হল। সবুজ প্রসন্নতা হলুদ ভ্রূকুটি করে লাল নিষেধ হয়ে গেল আমার সামনের গাড়িকে রুখে। আর উপায় নাই। ট্র্যাফিক আইন ভেঙেও আর এ বাধার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না।

ট্যাক্সিটা ডান দিকে বেঁকে চৌরঙ্গীর মোড়ের দিকেই আবার গেছে এই যা ভরসা। ওখানে সেই সুরেন ব্যানার্জির মোড়ে আর একটা গাঁট পার হতেই হবে। শুধু বাঁয়ে না ডাইনে কিংবা সোজা কোন দিকে বাঁক নেয় সেইটেই দেখা দরকার।

www.boiRboi.blogspot.com

বেপরোয়া হয়ে গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথের কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাল নিষেধ এখনো কিছুক্ষণ আছে তার মধ্যে ট্যাক্সিটা কোথায় দেখে নিতে হবে। গাড়ির ভেতরে বসে সেটা সম্ভব হত না।

ট্যাক্সিটা দেখতে পেলাম। যা আশা করেছিলাম তাই অন্ততঃ ঘটেছে। সবচেয়ে জ্বালানো মোড়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতেই হয়েছে অমন প্রায় দুকুড়ি গাড়ির ভিড়ে।

এদিকে আমার সময়ও তখন ফুরিয়ে এসেছে। সবুজ থেকে হলদে পেরিয়ে লাল হবার প্রায় কাঁটায় কাঁটায় লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে উঠলাম। পেছনের গাড়ির সারির হর্নের আওয়াজগুলো অনুবাদ করলে দুনিয়ার বাছা বাছা গালাগালগুলো পাওয়া যেত।

ডান দিকে ঘুরে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যেতে না যেতেই স্রোতের মুখ খুলে গেছে দেখলাম। এবারে আটকা পড়লে শিকারকে চোখে চোখে রাখার আশা ছাড়তে হবে।

বাহাদুরী দেখলাম আমার ড্রাইভারের। এইটুকুর মধ্যেই সাপের মত এঁকেবেঁকে ধাক্কা বাঁচাতে বাঁচাতে আর গাল খেতে খেতে ট্যাক্সিটার প্রায় নাগাল ধরে ফেললে ক'মিনিটের মধ্যে।

ততক্ষণে ট্যাক্সিটা বাঁক নিয়েছে একেবারে প্রায় উল্টো মুখে ডাফরিন রোড ধরে। আমাদেরও তাই নিতে হল।

ডাফরিন রোড থেকে একটু ক্যাজুরিনা ছুঁয়ে খিদিরপুর রোড।

উন্মাদের মত এলোমেলো ছোটার মানে কি? মেয়েটা কি আমার অনুসরণ করা টের পেয়েছে?

পেয়েছে বলে ত মনে হয় না। পাবার কোনো কারণই এখন নেই। এক লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে পিছন ফিরে তাকালে হয়ত সন্দিগ্ধ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল। তারপর থেকে কিন্তু আমার গাড়ি রীতিমত একটা দূরত্ব বজায় রেখে আসছে। ডাফরিন রোড থেকে ক্যাজুরিনা

www.boiRboi.blogspot.com

ছুঁয়ে খিদিরপুর রোডে পড়ার মধ্যে আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করিবার কোনো সুযোগই তাকে দেওয়া হয়নি। লম্বা সোজা রাস্তা। নজর এড়াবার উপায় নেই বলে আমাদের গাড়ি ফেলে রেখেছি অনেক পেছনে।

মেয়েটির এদিক ওদিক এলোমেলোভাবে সাড়ি নিয়ে ঘোরাটা সাবধানের মার নেই বলে নেহাৎ মামুলী নিয়ম রক্ষা বলে মনে হয়।

ধারণাটা যে আমার কতখানি ভুল ক'মিনিট বাদেই বুঝতে পারলাম। পাগলামি বলে যা মনে হয়েছে তার আড়ালে রীতিমত হুঁশিয়ারী প্যাঁচ লুকোনো।

দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম ট্যাক্সিটার বেগ কমে এসেছে। রেস-কোর্সের মেম্বারদের গেটের কাছে হঠাৎ সেটাকে থেমে যেতে দেখলাম। তখন আর আমাদের থামবার উপায় নেই। কমাবার বদলে স্পীড বাড়িয়ে সোজা গিয়ে সেণ্ট জর্জেস রোডে ডাইনে বাঁক নিতে হল। কিছুদূরে গিয়ে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মোড়ের কাছে এসে দাঁড় করালাম।

এখানটা একেবারে ফাঁকা। বাড়ি-ঘরের বালাই নেই বলে রাস্তার ওপর ত বটেই রেসকোর্সের বেড়ার শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়।

যা দেখলাম তাতে বোঝা গেল মেয়েটি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের গাড়ি ঘোরাবার সময়টুকুর মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া বুঝে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার এসপ্লানেডের দিকেই রওনা হয়েছে।

মেয়েটি অকারণ ওখানে নামে নি। একটি প্রাইভেট মোটর সেখানে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। খামখেয়ালীর অভিনয় দিয়ে এতক্ষণ অনুসরণ যদি কেউ করে থাকে তার চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোড়া থেকেই ঠিক ছিল এইখানে এসে গাড়ি বদল করা হবে। হচ্ছেও তাই।

www.boiRboi.blogspot.com

মেয়েটিকে এবার একটু এদিক-ওদিক চেয়ে প্রাইভেট গাড়িটায় গিয়ে উঠতে দেখলাম।

আমার অবশ্য ধরা পড়বার কোনো ভয় ছিল না। দুটো মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আমাদের গাড়িটা মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে একরকম অদৃশ্যই বলা যায়। তছাড়া আমাদের সামনে ইতিমধ্যে বড় বড় দুটি লরী ও গুটিপাঁচেক মোটর পার হবার সঙ্কেতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছে।

মেয়েটির নতুন গাড়ি আবার এসপ্লানেডের দিকেই চলল। এবার যাওয়ার মধ্যে তাড়া নেই।

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে আমিও পেছনে লেগে রইলাম আমার গাড়িতে।

খিদিরপুর রোড থেকে এবার রেড রোড তারপর অকল্যাণ্ড রোড হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড।

স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে হাওড়া পোলে গিয়ে ওঠবার পর সন্দেহ হল মেয়েটির গন্তব্য হাওড়া স্টেশনও হতে পারে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। গাড়ি নিয়ে মেয়েটি স্টেশনের ভেতরে অবশ্য ঢুকল না। স্টেশনের বাইরের গেটেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

এবারে বিনা দ্বিধাতেই যতটা কাছাকাছি সম্ভব তার পেছনে লেগে রইলাম। লাগেজ বুক করবার কাউন্টারের কাছে একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি সামনের বোর্ডে ট্রেনের সময়-নির্দেশিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ভেতরের হল দিয়ে কোনাকুনি উত্তর দিকের কোনো প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশে তখন চলেছে।

সাজ-পোষাক চেহারা যেরকম তাতে দক্ষিণ দিকের টিকিট ঘরে প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কিনবে ভেবেছিলাম। তা না কেনাতে ও উত্তর দিকের ইস্টার্ণ রেলের লোকাল ট্রেনের সব প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়াতে মাসিক টিকিটের যাত্রিণী বলেই তখন ধরে নিয়েছি।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এ-ধারণা অমনভাবে পালটাতে হবে ভাবতেই কি পারিনি!

হাত বিশেক দূর থেকে মেয়েটিকে অনুসরণ করছিলাম। সত্যি কথা যদি স্বীকার করি তাহলে বলতে হয় এ অনুসরণের মধ্যে শুধু নীরস কর্তব্যের দায়ই ছিল না, যৌবনোদ্ধত একটি সুঠাম দেহের গতিছন্দ উপভোগের ঈষৎ সঙ্কোচভরা আনন্দও একটু ছিল।

হলের মাঝখানের যানবাহনের জন্যে নির্দিষ্ট রাস্তা পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চমকে উঠলাম। মেয়েটি তার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে কি যেন বার করতে করতে যাচ্ছিল। অসাবধানে তার ব্যাগ থেকেই ছোট একটা নোটবই যে পড়ে গেছে তা সে খেয়ালই করে নি।

নোটবইটা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে স্বাভাবিক সৌজন্যে ও শিভ্যালরিতে মেয়েটিকে দিতে যাচ্ছিলাম। দু-পা গিয়েই হুঁশ হল, এ 'শিভ্যালরি' দেখাতে যাচ্ছি কাকে? সৌজন্য আর যেখানেই চলুক গোয়েন্দাগিরিতে অচল।

নোটবইটা পকেটেই রাখতে যাচ্ছিলাম। তার মাঝখানে নোটবই-এর চেয়ে আকারে বড় একটা আলগা কাগজ দেখে থামতে হল।

আলগা কাগজটা বার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটো যেন সেখানকার মেঝেতেই জমে গেল।

কাগজের বড় বড় হাতের লেখার অক্ষরগুলো চোখে না পড়ে উপায় নেই। আমার সম্পূর্ণ চেনা বড় বড় হরফে লেখা ছোট্ট একটা চিঠি।

ভাষাটা এই,—ধন্যবাদ! আর কষ্ট করতে হবে না। লীনাকে ছেড়ে দিয়ে এবার নিরামিষ ভোজনাগারে চলে এসো। আমি সেখানেই অপেক্ষা করে আছি।

পরাশর।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

সেই সাড়ে বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত এই হয়রানির পর এরকম চিঠি পেলে মনের ভাবটা কিরকম হয় ?

খুন জখমের বাসনা যদি না-ও হয় তবু এরকম বিশ্রী মোটা রসিকতা যে বন্ধুর সঙ্গে করতে পারে তার মুখদর্শন করতে ইচ্ছে হয় না নিশ্চয়।

নোটবই-এর ভেতরে পাওয়া চিঠিটি পড়ে সেখান থেকেই চলে যেতে পারতাম। সে রকম একটা সঙ্কল্প জেগেও ছিল মনে। শুধু তখনকার মতই চলে যাব না, পরাশরের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ওইখানেই শেষ করে দেব চিরকালের মত।

ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখলে পরাশর যা করেছে তার মধ্যে ত ক্ষমা করবার কিছু পাওয়া যায় না। শুধু আমাকে বোকা বানিয়ে অপদস্থ হাস্যাস্পদ করবার জন্যে যেন সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো।

মেট্রো সিনেমার বিপরীত দিকে রাস্তায় ওধারে চোখ-কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করার নির্দেশ পরাশরই দিয়েছিল। কার জন্যে, কেন, অপেক্ষা করতে হবে কিছু বলে নি, শুধু জানিয়েছিল যে বেলা দুটো নাগাদ একটি অবাঙালী চটকদার চেহারার মেয়েকে একলা মেট্রো সিনেমার কাছে যদি ঘোরাফেরা করতে দেখি তাহলে তার পিছু নিয়ে কিছুতে যেন তাকে চোখের আড়াল না করি।

মেয়েটির চেহারার বিবরণ বিশেষ কিছু দেয় নি। শুধু তার শাড়ী পরার ধরনটা পার্শীদের মতই হতে পারে এইটুকুই জানিয়েছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

বেলা দুটো নাগাদ একজনের বেশী চটকদার চেহারার অবাঙালী মেয়ের একলা মেট্রোর সামনে ঘোরাফেরা করা দস্তুরমত অস্বাভাবিক বলেই অনুসরণের পাত্রী চিনতে আমার অসুবিধা হবে না সে ধরে নিয়েছিল।

অসুবিধে আমার হয় নি সত্যিই। কিন্তু শেষকালে এ রসিকতার মানে কি?

সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরের রহস্যটা কি? কে এই অবাঙালী মেয়ে যে এই নাটকীয় ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে? শুধু আমায় নিয়ে একটু তামাসা করবার জন্যেই কি এমন একটা বিস্তারিত দৌড়ঝাঁপ লুকোচুরির আয়োজন করা হয়েছে ওই মেয়েটিকে নায়িকা করে?

এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলেও মনে আর শান্তি থাকবে না সারাজীবনে।

তাছাড়া পরাশর যা করেছে তার জন্যে চিরকালের মত তার সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদের আগে তাকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে আসাও দরকার।

তাই শোনাতে গিয়েও পরাশরের এক কথায় সব রাগ জল হয়ে গেল।

স্টেশনের দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি দুটি ভোজনাগার। নিরামিশ আর আমিষ। সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেই পরাশরকে দেখতে পেলাম। ম্যানেজারের কাউন্টারের ধারে একটি টেবিলে বসে আছে একা নয়, সঙ্গে আর একজনকেও দেখলাম।

আমার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল বোঝা গেল। আমায় ঢুকতে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে দূর থেকে উৎসাহভরে ডাক দিলে,—এই যে এই টেবিলে!

তার এই উৎসাহভরা ডাকেই মেজাজটা আবার বিগড়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে আবার বাইরে বেরিয়ে যাই।

www.boiRboi.blogspot.com

তা পারলাম না। তার বদলে তার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। আমার মুখের চেহারাটা দেখলে অবশ্য একটা খুনোখুনি গোছের কিছু করতে যাচ্ছি ভাবা যেত। দেখবার তেমন কেউ ছিল না, এই যা। এ সময়টা শাকাহারীদের পক্ষে বোধহয় প্রসস্ত নয়। রেস্তোরাঁটা প্রায় খালি।

পরাশরের টেবিলের কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সে সোৎসাহে বললে,—মার্ভলস্! একেবারে কামাল করেছ ভাই!

তার উচ্ছ্বাসের মধ্যে কপটতার আভাস পেলাম না। ব্যাপারটা তাই কিছুই না বুঝে ভেতরে ভেতরে হতভম্ব হলেও বাইরে মুখের চেহারাটা আষাঢ়ের মেঘ করে রেখেই বললাম,—তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ত?

গলার স্বরে যতখানি সম্ভব তিক্ত বিদ্রূপই ফুটিয়েছিলাম বলে আমার ধারণা। তার ফল অমন উল্টো হবে ভাবতেই পারিনি।

আমার প্রশ্নে যেন উপছে পড়া প্রীতিরই সন্ধান পেয়ে পরাশর জবাবে তার মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

উৎসাহের আতিশয্যে শব্দটা নিয়ে একটু প্যাঁচ খেলে বললে—সিদ্ধ হয়েছে মানে? একেবারে গলে কাদা হয়ে গেছে। পুলিশের লোকের দৌড় যে কত তাই আমি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। পুলিশের ধুরন্ধর চর যেখানে হার মেনেছে সেখানে অনায়াসে কাজ হাসিল করে তুমি আমার বড় মুখ করে বলা কথার মান রেখেছ। যা চেয়েছিলাম তাই প্রমাণ হয়েছে তোমার বাহাদুরীতে। কি বলেন মিঃ যুগলভাই?

যুগলভাই মাথা নাড়তে গিয়ে গলকম্বল গোছের গলার চর্বির থাক্ নাড়িয়ে সায় দিলেন, জরুর! জরুর!

যুগলভাইকে প্রথম থেকেই পরাশরের পাশের একটি চেয়ারে দেখেছি। কিন্তু নামটা তখনও জানবার সুযোগ হয়নি, বিশেষ নজরও দিইনি তাঁর দিকে।

এখন ভালো করে চেয়ে শুধু তাঁর বর্তুলাকার বিশাল বপুই দেখলাম না, দশ আঙুলের দশখানা পাথর বাঁধানো আংটি, গলার সরু চেন, কানের মাকড়ি আর সোনা বাঁধানো কটা দাঁতও মনের মধ্যে একরকম ছাপা হয়ে গেল। শুধু শ্রীঅঙ্গের সোনাদানা হারে মোতির ঝিলিক থেকেই নয়—যুগলভাইয়ের পোশাকআসাক থেকেই তিনি কি দরের মানুষ তা বোঝা উচিত। তাঁর মত মানুষের হাওড়া স্টেশনের এই শাকাহারী ভোজনালয়ে দেখা পাওয়াটা অবিশ্বাস্য।

পরাশর সেইটে অনুভব করেই বোধ হয় রেস্তারাঁ বয়ের এগিয়ে দেওয়া ভাজা মৌরী আর কটা দাঁতনকাঠি ছড়ানো এলুমিনিয়মের ছোট ডিসটায় দুটো টাকা রেখে উঠে পড়ে বললে, আর তাহলে এখানে বসে থাকবার দরকার নেই। লীনা দেবী বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠলেন অপেক্ষা করে করে। চলুন আপনার বাড়িতেই যাব।

তা যাইতে আছি—যুগলভাই তাঁর অপূর্ব খিচুড়ি ভাষায় ক্ষোভ করে বললেন,—লেকিন আপনে দাম দিলেন কেনো। কাফি ত হামি মঙ্গায়েছি।

হ্যাঁ আপনিই ফরমাস করেছেন। পরাশর হেসে তাঁকে প্রবোধ দিলে, তবে এ দামটা আমি দিলাম ভবিষ্যতে আপনার ঘাড় ভালো করে ভাঙবার আশায়। দু' টাকার বিল আপনি কি দেবেন! দুশ' টাকার বিল না হলে আপনার কি আর মান থাকে!

বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!—যুগলভাই খুশি হয়ে আশা দিলেন, —দো শও কেয়া, হামি দো হাজার রূপেয়াকো পার্টি দিবে। অপনে শিরফ্ এহি তাজ্জব ব্যাপারকে একটা ফয়শালা করিয়ে দিন।

সেই চেষ্টাই ত করছি। চলো ভদ্র। গাড়িটা স্টেশনের বাইরে রাখা আছে।—বলে পরাশর আমায় এগিয়ে যাবার সুযোগ দিলে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে স্টেশনের ভেতর দিয়ে বাইরে যেতে যেতে পেছনে পরাশরের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

www.BanglaBook.blogspot.com

শুনলাম যুগলভাইকে গর্বভরে সে বলছে,—আপনি কিন্তু বাজি হেরে গেছেন যুগলভাই। আপনি বলেছিলেন আগাগোড়া চোখে চোখে রাখা কারুর সাধ্যে কুলোবে না! শিকার এক সময়ে হাত ফস্কে যাবেই। মনে আছে ত?

হাঁ, ইয়াদ ত আছে!—যুগলভাই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, —লেকিন হামি শোচতে আছি আউর এক বাত।

কি আবার ভাবছেন আপনি?—হেসে জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

চলিয়ে! বললেন যুগলভাই, গাড়িমে বৈঠকে বোলুঁ।

তথাস্তু।—বললে পরাশর।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে গাড়ি পর্যন্ত সবাই নীরবেই গেলাম। যুগলভাই, লীনাদেবী, পরাশরের আমার কৃতিত্ব নিয়ে উচ্ছ্বাস, পুলিশের কোথায় কি যেন অক্ষমতা নিয়ে ইঙ্গিত, সব কিছু মিলে আমার মাথা ঘুরিয়ে তখন রীতিমত পাক দিচ্ছে।

এ কি রহস্যের গোলকধাঁধার মধ্যে পরাশর আমায় ঘুণাক্ষরে কিছু না জানিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে?

এখন পরাশর আর যুগলভাইয়ের সঙ্গে চলেছি বা কোথায়? লীনার নামটা যে উল্লেখ করা হয়েছে তা খেয়াল করেছি অবশ্য। জেনেছি যে লীনা গাড়িতে অপেক্ষা করছে। কোথায় সে গাড়ি?

খুঁজে হয়রান হতে হল না।

কোথায় যাচ্ছেন মিঃ ভদ্র? এই যে গাড়ি আসুন।

নারীকণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা শুনে ডান দিকে ফিরে যাকে দেখলাম, তাকে দেখে যতটা, তার চেয়ে যে গাড়িটার 'লেফট হ্যাণ্ড ড্রাইভ'-এর হুইল ধরে সে বসে আছে তা দেখে কম তাজ্জব হলাম না।

গাড়ির হুইল ধরে বসে আছে সেই লীনা আমায় অর্ধেক কলকাতা যে প্রায় নাকে দড়ি দিয়ে দৌড় করিয়েছে।

আর যে গাড়ির হুইল ধরে বসে আছে সে ধরনের গাড়ি

www.boiRboi.blogspot.com

কলকাতার রাস্তায় কচিৎ কখনো চোখে পড়লে এখনো পাত্রভেদে মুগ্ধ বিহ্বল কি ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হয়।

বিদেশী এমব্যাসী কি কন্‌সলেট-এর হাতফেরতা করিয়ে এসব গাড়ি যাঁরা জোটান তাঁরা সবাই স্বয়ং কুবের না হন তাঁরই মাস-তুতো পিসতুতো ভাই।

লীনা তখন ডান হাত বাড়িয়ে সামনের সীটের দরজা খুলে দিয়েছে।

বেশ একটু বিভ্রান্তভাবে পেছন থেকে পরাশরের ঈষৎ ঠেলায় সামনের সীটে উঠে বসার পর ব্যাপারটা খেয়াল করলাম।

পরাশর তখন যুগলভাইকে নিয়ে পেছনের সীটে বসেছে আর গাড়ির জগতের সেই উচ্চৈঃশ্রবা প্রায় নিঃশব্দে স্টার্ট নিয়ে অতবড় দীর্ঘ দেহটা হাওড়া স্টেশনের ট্রাফিকের জঙ্গলের ভেতর দিয়েও যেন মসৃণ সর্পিল গতিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

লীনা শুধু ঝকমকে আধুনিক সুঠাম চেহারাসর্বস্ব তরুণী নয়, তার হাতে যন্ত্রের গাড়ি যেন পোষমানা জানোয়ার। গাড়ির গুণে ত বটেই তার চেয়ে বেশী চালাবার কসরতে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে ব্র্যাবোর্ন রোড দিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ার হয়ে এসপ্ল্যানেড ছুঁয়ে রেড রোডে কখন পড়লাম যেন টেরই পেলাম না।

রেড রোডে পড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লক্ষ্য করে গাড়িটার হুইলে একটা আলগা হাত মাত্র রেখে যেন তার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়ে লীনা আমার দিকে ফিরে একটু হাসল!

এ হাসির জবাবে হাসিই প্রশস্ত।

কিন্তু চট করে মুখে তা আনতে পারলাম কই!

লীনা সেইটেকেই ইঙ্গিত হিসেবে ধরে মধুর মিনতির ভঙ্গিতে বললে—আমার ওপর রাগ করবেন না মিঃ ভদ্র। আমি শুধু আপনার বন্ধুর হুকুম তামিল করেছি।

আর তাই করেই আমায় বাজিটা জিতিয়ে দিয়েছ! পরাশর

www.boiRboi.blogspot.com

পেছন থেকে উচ্ছ্বাসভরে জানালে,—তোমায় ধন্যবাদ লীনা। সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ অবশ্য আমার বন্ধু কৃত্তিবাসেরই পাওনা। কারণ বাহাদুরীটা তারই। আমি এখনো বলছি—মার্ভল্‌স্!

পরাশরের উচ্ছ্বাসের ধরনে মনে হল নিজে থেকে প্রসঙ্গটা তুলতে না চেয়ে এমনি একটা ছুতোর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল।

আমি কিন্তু আর মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না। গলার স্বরে বিরক্তি আর অধৈর্যটা গোপন না করেই বললাম,—হেঁয়ালিটা কিন্তু ক্রমশঃ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে পরাশর। দুপুর রৌদ্রে এক বেলা ধরে অর্ধেক কলকাতা শুধু একটা বাজি জেতবার জন্যে বুনো হাঁসের পেছনে ছুটিয়ে আমায় হয়রান করাটা কিরকম রসিকতা আমি জানতে চাই!

বলছ কি!—পয়াশর আমার চড়া মেজাজের অভিযোগকেও পরিহাসে হাল্কা করে দিয়ে আহত বিস্ময়ের ভান-করা গলায় বললে,—বুনো হাঁস বলছ তুমি লীনাদেবীকে।

বোলিয়েছেন তাতে গলতি কি হোইয়েছে!—যুগলভাই আমায় সমর্থনের ছলে তাঁর রসিকতার বহরের পরিচয় দিলেন।—সোওরস্বতী মাইজী যাতে সওয়ার হইয়ে আসেন ও ভি তো হাঁস আছে, উমদা সফেদ কিৎনী খপ্‌সুরৎ হাঁস!

হ্যাঁ আমরা বলি শ্বেতমরালী!—পরাশর যুগলভাই-এর যুক্তিতেই যেন নিজের ভুলটা সংশোধন করলে—তা শ্বেতমরালীর সঙ্গে তুলনা করে থাকলে অবশ্য সাত খুন মাফ!

এসব জোলো সস্তা রসিকতায় গা জ্বালা করে উঠছিল। কড়া গলায় যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বলার আগে লীনা সে জ্বালায় একটু অন্ততঃ ঠাণ্ডা জল ছিটোলে। আমার পক্ষ নিয়ে অভিযোগের সুরে বললে,—যা বলেই কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করুন, মিঃ ভদ্র কিন্তু সত্যিই রাগ করতে পারেন। যা হয়রান ওঁকে করা হয়েছে, তাতে শুধু একটু মার্ভল্‌স্ শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

লীনার এ কথাগুলো অবশ্য বাংলায় নয় ইংরেজীতেই সে বললে। বুঝলাম বাংলাটা নির্ভুল বললেও ভাষার দৌড় তার বেশী নয়।

লীনার সমর্থনে কিছুটা শান্ত সত্যই অবশ্য হলাম। গলাটা যতটা কড়া পর্দায় তোলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়ে অনেকটা নামিয়ে বললাম,—আমার প্রশ্নটার জবাব কিন্তু এখনো পাই নি।

তোমার তর সইছে না, জানি।—পরাশর যেন হঠাৎ 'ইডিয়ম'-এর ওস্তাদ হয়ে জানালে,—ওদিকে পসরাও সাজানো। না-টা শুধু ঘাটে লাগুক।

হাঁ, হাঁ, যুগলভাই সোৎসাহে পরাশরের আশ্বাসে সায় দিলেন,—সব কুছ বোলবে ইসি লিয়ে তো আপনাকে লিয়ে যেতে আছি আমার গরীবখানামেঁ। সিরফ্ ইয়ে গাড়ি পৌঁছনে কি ওয়াস্তা।

এর পর আর বলবার কিছু নেই। ধৈর্য ধরে তাই চুপ করে রইলাম।

গাড়িটা তখন রেড রোড থেকে ক্যাজুয়ারিনা রোড ধরেছে। ডাইনে খিদিরপুর রোডটার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ আগেকার ছোটা-ছুটির খেলাটা মনে পড়াতেই বোধহয় লীনা, আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে,—ওই খিদিরপুর রোডে রেসকোর্সের ধারেই আপনাকে গুলিয়ে দিয়ে হারিয়ে দেব ভেবেছিলাম কিন্তু পারলাম না। আপনি সত্যিই মিঃ বর্মার উপযুক্ত বন্ধু!

এ প্রশংসাটাও ইংরেজিতে। প্রশংসাটা অবশ্য ভালোই লাগল। মৃদু একটু হেসে নীরবেই সেটা জানালাম।

গাড়িটা ক্যাজুয়ারিনা থেকে হসপিট্যাল রোড ধরে আচার্য জগদীশ বসু রোড পার হয়ে ভবানীপুর রোড ছেড়ে রিফরমেটরী স্ট্রীট দিয়ে আদিগঙ্গার পোল পেরিয়ে আগে কার ছোটলাট ভবন এখনকার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী প্রদক্ষিণ করে আলিপুর রোডে পড়ল।

সেখান থেকে এক জায়গায় একটু বাঁক নিয়ে যে প্রকাণ্ড

www.boiRboi.blogspot.com

বাগানওয়ালা একেবারে আধুনিক হাল ফ্যাশানের জমকালো ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে এসে তারপর থামল কলকাতার পুরানো বাসিন্দা বলেই বোধহয় তার খবর আমার মত সামান্য এক সাপ্তাহিকের সম্পাদকের কাছে পৌঁছোয় নি।

যে জগতে আমাদের ঘোরাফেরা করতে হয় এসব নতুন কুবের-ধাম তার বাইরে কিছুদিন হল গড়ে উঠতে শুরু করেছে। স্থাপত্য থেকে এসব বিলাসপুরীর সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সবই আলাদা।

গাড়ি থেকে নেমে লিফটে গিয়ে উঠে এই কলকাতা শহরেই আছি কিনা সন্দেহ হল।

বাড়িটার বাইরের পরিবেশ যেমন আলাদা, ভেতরটাও তাই।

লিফটাতেই যেন খাস মার্কিনমুলুকে পৌঁছবো মনে হল। লোহার কোলাপসিবল ডবল গেট টানা যে কাঠের বাক্সে আমরা অভ্যস্ত সে লিফট নয়। একেবারে ঝক্‌ঝকে স্টিলের নিখুঁত ধাতব খাঁচা। ভেতরে ঢুকে যে তলায় যাব তার বোতাম টিপলেই আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর যে যে তলা বেয়ে উঠছি তাও নম্বর-দেওয়া বোতাম জ্বলে উঠে টের পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট তলায় এসে আপনা থেকেই লিফট থামে আর দরজা খুলে যায়।

কলকাতা শহরে আমি গাঁইয়া নই। এ শহরে এরকম লিফটে আগে কখনো চড়িনি এমনও নয়! কিন্তু গাড়িবাড়ি পরিবেশ তার ওপর লীনা যুগলভাই আর তুপুরের ঘটনা সবকিছু মিলে আমার মাথাটা তখন বেশ একটু গুলিয়ে দিয়েছে। লীনা লিফটে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছে, তার গা থেকে দামী বিদেশী সেন্টের যে গন্ধটা পাচ্ছিলাম সময় ও ভূমিকা অন্যরকম হলে তার মাদকতা স্বীকার না করে পারতাম না।

অটোমেটিক লিফট সাততলায় গিয়ে থামল। দরজা খুলে বেরিয়ে যে-ফ্লাটে যুগলভাই আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন তার

www.boiRboi.blogspot.com

ঐশ্বর্য-বিলাসের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা আর করবো না। আমরা গিয়ে পূবের বারান্দায় বসেছিলাম। সাততলার ওপর সেখানে বিরল ফুলের একটা বাগান যেন কাছেরই হর্টীকালচারাল গার্ডেন থেকে তুলে আনা হয়েছে।

সেই বারান্দার সঙ্গে মানানসই বাহারি কেদারায় বসবার পর যুগলভাই কি আমরা পান করতে চাই জানতে চাইলেন।

ধোব-দুরস্ত যথাযোগ্য উর্দিপরা একজন বেয়ারা তখন অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এইমাত্র ত কফি খেয়ে আসছি। পরাশর বললে, আমার আর কিছুই চাই না। তবে মিঃ ভদ্র সুধা না গরল কিসে চুমুক দিতে চান ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

পরাশরের হঠাৎ বেখাপ্পা এই বাক্‌চাতুরী আর তার সঙ্গে এসব ফাঁকা লোকলৌকিকতা তখন আমার আর ভাল লাগছে না। আসল কথাটা পাড়বার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। আপ্যায়নের ঝামেলা চুকোবার জন্যে এক কাপ কফি চেয়ে নিজের প্রশ্নটা জানালাম।

সমস্ত ব্যাপারটা এবার কেউ আমায় খুলে বলবেন? গলাটা যত চেয়েছিলাম ততটা মোলায়েম রাখতে পারলাম না, একটু রুক্ষই হয়ে গেল।

নিশ্চয় নিশ্চয়।—পরাশর তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিলে। তারপর যুগলভাই-এর দিকে ফিরে বললে,—কি যুগলভাই আপনিই বলবেন, না আমি? ব্যাপারটার উনকুটি চৌশট্টি অনেক আছে ত! আমি আবার হাঁড়ির খবর সব এখনো পাই নি।

আরে আপনিই বোলে দিন না।—যুগলভাই পরাশরকে উৎসাহ দিলেন,—আপনার যেখানে গলতি হোবে লীলা বোলিয়ে দিবে। হামি বাংলা বোললে আপলোক ত থোড়াই সমঝাবেন! হিন্দী বোললে ভি ওই মাফিক।

তার চেয়ে মিস লীনাই বলুক!—পরাশর হঠাৎ সমস্যাটার সমাধান করে ফেলল।

আমি!—লীনার মৃদু একটু আপত্তি দেখা গেল,—আমি তো মিঃ ভদ্রের মতই বাইরের লোক। আমি আর কতটুকু জানি।

তবু বাইরের লোক হিসেবে, আপনার বলার দামই বেশী। পরাশর লীনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝালে,—যুগলভাই প্রথমতঃ ভালো করে গুছিয়ে বলতেই পারবেন না, দ্বিতীয়তঃ উনি নিজেই এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত বলে, বলার মধ্যে নিরপেক্ষতা রাখতে পারবেন না। আমার বেলা অসুবিধে আর এক দিক দিয়ে। প্রথমতঃ আপনি যা জানেন তার চেয়ে বেশী কিছু আমি জানি না, তার ওপর বলতে গেলে ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনের যে তোলপাড় চলছে সে সবও বেরিয়ে পড়ে বিবরণটা একপেশে করে দিতে পারে। আপনার বেলা সেসব ভয় নেই। সোজা সরল বিবরণ অন্ততঃ পাব।

পরাশরের যুক্তিগুলো খুব যে জোরালো তা আমার মনে হল না। কিন্তু যা সে চেয়েছিল সে কাজ অন্ততঃ তাতে হল। লীনা ওই যুক্তিই মেনে নিয়ে একটু হেসে আমার দিকে ঈষৎ লজ্জিত কটাক্ষ একবার ছুঁড়ে বললে,—মিঃ ভদ্রকেই আমার ভয়। সম্পাদক মানুষ আমার বর্ণনার কত না খুঁত ধরবেন!

জবাবে রসিকতা করে বলতে পারতাম, কোনো ভাবনা নেই আপনার। খুঁত বেছে কপি কারেক্ট করেই আপনার রিপোর্ট ছাপব।

কিন্তু রসিকতার সে মেজাজ তখন নেই। শুধু বললাম—আপনি ত পরীক্ষা দিতে বসেন নি। তাতে আপনার অত ভয় কিসের?

পরাশর এই কথা শুনেই হঠাৎ অমন করে হেসে উঠবে ভাবতেই পারিনি। যেন কৌতুকে ডগমগ হয়ে হাসতে হাসতে বললে,—খুব ভালো বলেছ কৃত্তিবাস। এ তো আর পরীক্ষা দেওয়া নয়!

আমার ওই কথায় অত হাসবার কি পেল পরাশর, সত্যিই বুঝে

উঠতে পারলাম না। বিশেষ না ভেবেচিন্তে যে অন্যায় হয়রানিটা আমায় করিয়ে ফেলেছে তার গ্লানি একটু বিঁধছে বলেই সবকিছুর মাত্রা সে ঠিক রাখতে পারছে না বলেই মনে হল।

ভেতরে ভেতরে একটু গরম হয়ে বললাম,—নিন, আরম্ভ করুন মিস লীনা। বুঝতেই পারছেন কিরকম উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

লীনাকে আর বোধহয় সাধতে হত না। কিন্তু আরম্ভ করা তার হল না।

হঠাৎ ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে আমাদের টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বললেন,—বাঃ দিব্যি আসর জমিয়েছ দেখছি তোমরা! আমি তাই ভাবি লীনা এমন অসময়ে তার ঘর ছেড়ে গেল কোথায়?

লোকটিকে বারান্দা দিয়ে আসবার সময়েই টলতে দেখেছিলাম। এখন কাছে এসে দাঁড়াবার পর তাঁর জড়ানো স্বর আর নিঃশ্বাসের সুবাসেই তাঁর অবস্থাটা এই বিকেল বেলাতেই যে তুরীয় তা গোপন রইল না।

তাঁকে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লীনার মুখে যেন একটা অস্বস্তি ও ভয়ের ছায়া আর যুগলভাই-এর মুখে একটা বিরক্তির ভ্রূকুটি দেখা গিয়েছিল।

যুগলভাই মুখের ভাবে না পারলেও গলার স্বরে তীব্র বিরক্তিটা দমন করে বললেন,—আমাদের অত্যন্ত দরকারী একটা আলোচনা হচ্ছে ভাইজি। লীনাকে যদি তোমার দরকার থাকে তাহলে একটু পরেই সে তোমার ওখানে যাচ্ছে।

একটু পরেই আমার ওখানে যাচ্ছে। বাঃ, চমৎকার! এতক্ষণ তোমাদের কাছে বসে লীনা সঙ্গ দেবে, কেমন? কেন আমি তোমাদের দরকারী আলোচনায় থাকতে পারি না!—জড়ানো অস্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলতে বলতে যুগলভাই-এর ভাইজি পাশের অন্য টেবিল থেকে একটা কৌচ নিজেই টেনে এনে লীনার পাশে

www.boiRboi.blogspot.com

রেখে তার ওপর বসতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললেন—তোমাদের দরকারী আলোচনাটা কি? ওই জুয়েলারীগুলো চুরির ব্যাপার ত? তাতে আমারও যোগ দেবার অধিকার আছে। আলবৎ আছে। আমিও ও দোকানের অর্ধেক মালিক! কেমন মালিক নয়?

যুগলভাই-এর ভাইজি আমাদের সকলের দিকে একবার তাঁর রক্তচক্ষু ঘোরালেন।

আমরা অবশ্য নির্বাক। যুগলভাই নিজেকে শান্ত রেখে অবোধকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন,—কেউ ত তা বলেনি ভাইজি। মনুভাই যুগলভাই-এর তুমি যে অর্ধেক মালিক সে ত কারবারের নামেই প্রকাশ। কারবারের মালিক হিসেবেই সেদিন যা হয়েছে তার তাড়াতাড়ি কিনারা যাতে হয় তা তোমারও দেখা দরকার। তুমি যদি সত্যি এ আলোচনায় থাকতে চাও তাহলে আমাদের আপত্তি কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু সত্যিই এ আলোচনায় যোগ দেবার মত মেজাজ যদি তোমার এখন না থাকে তাহলে তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে বিশ্রাম করো। যা আমাদের কথা হবে সব তোমায় পরে জানাচ্ছি।

তুমি কেন জানাবে! মনুভাই প্রায় খিঁচিয়ে উঠল,—যা জানাবার লীনা জানাবে! আমি ওর মুখে শুনতে চাই।

বেশ ওই জানাবে! কথা দিলেন যুগলভাই। তাতে লীনার মুখটা কিন্তু আরো যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল মনে হল।

এই আশ্বাস পেয়েই মনুভাই তখন উঠে পড়েছেন।

উঠে পড়বার পর তাঁর মুখে একটা যেন শয়তানী হাসির আভাস।

একহাতে নিজের কেদারার পিঠটা ধরে যুগলভাই-এর দিকে ফিরে অন্য হাতের একটা আঙুল শাসাবার ভঙ্গিতে তুলে বললেন,—বলছ যখন আমি যাচ্ছি। কিন্তু কেন আমায় তাড়াতে চাইছ তা

www.boiRboi.blogspot.com

আমি বুঝি না বলে মনেও কোরো না। কোথা থেকে এই যে টিকটিকি দুটোকে ধরে এনেছ, ওদের সঙ্গে মাথা খাটিয়ে আমাকে জালে ফেলবার চেষ্টা করবে, এই তো! কিন্তু পারবে না, আমার চুলের ডগাটিও ছুঁতে পারবে না! আমার প্যাঁচ ধরা তোমাদের এসব পুঁচকে গোয়েন্দার সাধ্য নয়। শার্লক হোমসকে ডাকতে হবে। শার্লক হোমস কি হারকিউলে পোয়ারো!

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে কি প্রায় পিলে-চমকানো হাসি মন্নুভাই-এর। সে হাসি না থামিয়ে টলতে টলতে তিনি লিফটের দিকে চলে গেলেন।

যাবার সময় তাঁর দিকে আপনা থেকেই দৃষ্টিটা গিয়েছিল। তাতে একটা ব্যাপার দেখে বেশ একটু খটকা লাগল। টলতে টলতে প্রায় ফ্ল্যাটের ভেতর পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ যেন তাঁকে বেশ সামলে সোজা হয়ে লিফটের প্যাসেজের দিকে হাঁটতে দেখলাম।

সে কি আমারই দেখার ভুল? না, তাঁর মাতলামিটাই একটা মিথ্যে অভিনয়?

লীনার মুখে তারপর মোটামুটি সমস্ত ব্যাপারটা শোনবার সুযোগ পাওয়া গেল।

মন্নুভাই চলে যাবার পরও লীনার বেশ খানিকক্ষণ লাগল যেন নিজেকে সহজ স্বচ্ছন্দ করতে। কাহিনীটা অবশ্য সে একরকম গুছিয়েই বললে। তার বিবরণের ফাঁকগুলো ভরাতে যুগলভাই আর মাঝে মাঝে পরাশরও সাহায্য করলে অল্পবিস্তর।

ব্যাপারটা যে একটা জুয়েলারীর কারবার নিয়ে তা স্পষ্ট করে না বললেও এতক্ষণে নিশ্চয় বোঝা গেছে।

জুয়েলারীর কারবারটার যথার্থ নামটা জানাব না। মন্নুভাই যুগলভাই-এর নামগুলোও যেমন আসল নয়, কারবারটার নাম তেমনি ওই দুটি কাল্পনিক নাম একত্র করে মন্নুভাই যুগলভাই বলেই ধরা যাক।

ঠিক নাম ঠিকানা দিতে না পারলেও এসব নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন আর হীরে মুক্তো চুনি পান্নার জগতের খোঁজ রাখেন তাঁরা মনুভাই যুগলভাই বলতে যে কাদের কথা বলা হচ্ছে তেমন কষ্ট না করেই বুঝতে পারবেন।

সত্যি কথা বলতে গেলে কলকাতা শহরে ওরকম আধুনিক পয়লা নম্বরের জমকালো জুয়েলারী দোকান আর নেই।

বেশী দিন নয় দোকানটা কলকাতার একটা যাকে বলে খানদানী বাণিজ্যের পাড়ায় মাত্র বছর দুই হল বসানো হয়েছে। দোকানটা অবশ্য মাত্র দু রছরের নয়; বহুকালের পুরোনো। বোম্বাই থেকে কলকাতায় এ কারবার যিনি তুলে এনেছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত একটা সাধারণ এলাকায় ত্রিশ বছর ধরে দোকানটা চালিয়েছেন। বছর পাঁচেক আগে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের হাতে আধুনিক কায়দা-কানুনের সঙ্গে ধনীদের সখ আর দেমাক বাড়বার দরুনই মনে হয় জুয়েলারীর কারবার দেখতে দেখতে ফেঁপে ওঠে।

ছেলেদের উদ্যোগেই জুয়েলারীর কারবার আগেকার সাধারণ ঠিকানা থেকে তুলে এনে দেশ-বিদেশের সঙ্গে পাল্লা-দেওয়া রূপকথার মণি-মুক্তোর মহলের মত সাজানো ঝলমলে দোকান ঘরে বসানো হয়।

দোকান ঘর বললে অপমান করা হয়—তাকে 'হল' বলাই উচিত।

ভারতবর্ষের ধনীরা ত বটেই বিদেশের সব জায়গার পয়সাওয়ালা টুরিস্টরা ও এদিকে সখ থাক বা না থাক শুধু ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক অলঙ্কার শিল্পের নমুনা দেখবার জন্যেও এ হলে অনেকে ঘুরে যায়।

মনুভাই যুগলভাই জুয়েলার্স বলতে এই দোকানই বুঝতে হবে।

এই দোকানে মাত্র সাতদিন আগে আশ্চর্য এক চুরি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য অনেকগুলি কারণে।

প্রথমত এত বড় দোকান যেমন তেমনি তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও প্রায় নিখুঁত।

দরজায় একজন নয় বন্দুকধারী দুজন ধরাচুড়ো পরা গার্ড সারাক্ষণ খাড়া।

সে পাহারা না হয় লুটপাটের চেষ্টার বিরুদ্ধে। ছিঁচকে চালাকির চুরি ঠেকাবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে।

কাউন্টারে কাউন্টারে যারা খদ্দেরদের তুষ্ট করবার জন্যে খাড়া তারা ত সজাগ থাকেই তার ওপর সাদা পোশাকে জনতিনেক মেয়ে পুরুষ, কেউ নিজেই খরিদ্দার, কেউ দোকানের ব্যবসার সূত্রে-আসা বাইরের লোক হিসাবে ঘোরাফেরা করে সকলের ওপর নজর রাখে।

তা সত্ত্বেও দিন সাতেক আগে একটা অত্যন্ত বড় রকমের চুরি সকলের চোখের ওপর দিয়েই হয়ে গেছে বলা যায়।

চুরির ফিকিরটা খুব নতুন কিছু নয়। এ ধরনের কৌশল প্রয়োগের কথা আগেও শোনা গেছে।

দিনের বেলা দুপুর বারোটা নাগাদ একটি বিরাট গাড়ি দরজার সামনে রাস্তায় থামা দোকানের ভেতর থেকে দু-একজন কর্মচারীর চোখে পড়েছে। তার পরেই তরুণী আধুনিকা অত্যন্ত ফ্যাশানেবল পোশাকের একটি মহিলা সঙ্গে একজন উর্দিপরা বেয়ারাকে নিয়ে দোকানের হলে ঢুকেছেন। বেয়ারার হাতে একটি মাঝারি আকারের কারুকাজকরা কাঠের বাক্স।

তরুণী মহিলা এদিক-ওদিকে চেয়ে প্রাচীন অলঙ্কার বিভাগের খোঁজ করলেন অনুসন্ধানের কাউন্টারে।

প্রাচীন অলঙ্কার বিভাগ বলে একেবারে আলাদা কোনো কাউন্টার নেই। অত্যন্ত দামী জয়েলারী বিভাগেরই সেটা একটা অংশ।

www.boiRboi.blogspot.com

তরুণী মহিলা সেই কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াবার পর তাঁর উর্দিপরা অনুচর এতক্ষণ যে বাক্সটি তাঁর সঙ্গে বয়ে ফিরছিল সেটি কাউন্টারের ওপর রেখেছে।

মহিলা তাকে একটু বাঁকা ভাঙা হিন্দীতে গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

যো হুকুম! বলে বেয়ারা চলে যাবার পর মহিলা তাঁর দামী হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটি চিঠি বার করে কাউন্টারের কর্মচারীর হাতে দিয়েছেন।

চিঠিটা বোম্বাই-এর এক অত্যন্ত নামকরা জুয়েলারীর কারবারীর। সে কোম্পানীর সঙ্গে মনুভাই যুগলভাই-এর ভালোরকম পরিচয় ও লেনদেন আছে।

চিঠিতে তরুণী মহিলার পরিচয় দেওয়া ছিল। তরুণীর নাম মিস জাভেরী। বোম্বাই-এর এক বিশিষ্ট ধনীর মেয়ে। দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার বাবার আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা।

মেয়েটির মা ফরাসী মহিলা বলে কিছুকাল বাদে প্যারিসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জুয়েলার্সদের যে প্রদর্শনী হচ্ছে সেখানে ভারত ও দূরপ্রাচ্যের বিরল প্রাচীন ও আধুনিক জুয়েলারী কিছু নিয়ে যেতে চান, নিজেদের নামে একটি স্টল নিয়ে দেখাবার ও সেরকম দাম পেলে বিক্রী করবার জন্যে।

মিস জাভেরী বোম্বাই থেকে আমেদাবাদ দিল্লী হয়ে তাই কলকাতায় যাচ্ছে। মিস জাভেরী যা চায় সে বিষয়ে মনুভাই যুগলভাই-এর কাছে পুরোপুরি সাহায্য পাবে এই বিশ্বাসেই বোম্বাই-এর বিখ্যাত জুয়েলার্স এই পরিচয়পত্র দিয়েছেন।

এ চিঠি পরবার পর মিস জাভেরীর খাতির যে বেড়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য। মিস জাভেরীর চেহারা পোশাক অবশ্য আপনা থেকেই মুগ্ধতা ও সমীহ জাগাবার মত। মাথার সোনালী চুল মুখের গড়ন ও প্রসাধনে, না জানা থাকলেও ইউরোপীয় রক্তের একটু

মিশেল অনুমান করা খুব কঠিন নয়। পরনে ভারতীয় শাড়ী থাকলেও তা পরার ধরণে ও তার সঙ্গে ব্লাউজের উপকরণ থেকে কাট-ছাঁটের বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত আধুনিক বিদেশী ছোঁয়া লাগা রুচির প্রভাব গোড়াতেই চোখে পড়ে। গলার স্বর আর উচ্চারণের ভঙ্গিতে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় সন্দেহাতীত ভাবে।

কাউন্টারের কর্মচারী মিস জাভেরীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ভাগ্যের কথা এই যে, কারবারের মালিক দুই ভাই-ই সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সময়টিতেই দোকানে উপস্থিত।

যুগলভাই অবশ্য নিত্যই দোকানে সেই সময়ে হাজিরা দেন। কিন্তু মনুভাই-এর দেখা দোকানে পাওয়া যায় না বললেই হয়।

সেই দিনটিতে আশ্চর্যভাবে মনুভাই কি খেয়ালে কে জানে সেই সময়টিতেই দোকানে এসেছেন।

কাউন্টার-ঘেরা শো-রুমের পেছনেই মালিক দু-ভাই-এর ভেতরের অফিস ঘর।

দামী জুয়েলারীর কাউন্টারের কর্মচারী মিস জাভেরীকে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে ভেতরের অফিস ঘরে গিয়ে খবরটা জানিয়ে মিস জাভেরীর আনা চিঠিটা দেখিয়েছে।

চিঠিটা প্রথমে পড়েছেন যুগলভাই। তাঁর পড়া হতে না হতে তাঁর হাত থেকে প্রায় চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে মনুভাই সেটা পড়ে ফেলে উৎসাহভরে 'কেয়াবাত' বলে প্রায় চিৎকার করে উঠেছেন।

যুগলভাই তখন কাউন্টারে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মনুভাই তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছেন—আরে যাচ্ছ কোথায়? এত বড় শাঁসালো খদ্দের! এখানে অফিসে ডাকো। নাম মিস জাভেরী শুনছি। চেহারাটাও ত কাউন্টারের চেয়ে এখানে ভালো করে দেখা যাবে!

মনুভাই-এর কথায় প্রতিবাদ না করে যুগলভাই মিস জাভেরীকে ভেতরেই আনতে বলেছেন।

মিস জাভেরীকে ভেতরে নিয়ে এসেছে কাউণ্টারের কর্মচারী।

চেহারা পোশাক চালচলন দেখে যুগলভাই মনুভাই দুজনেরই যাকে বলে ভক্তি হয়েছে। বোম্বাই-এর যে জুয়েলার্স কোম্পানী মিস জাভেরীকে পরিচয়পত্র দিয়েছে তাদের সঙ্গে কিভাবে কতদিনের যোগাযোগ যুগলভাই একটু বুঝি জানতে চেয়েছিলেন। মনুভাই সে প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে হাসি-ঠাট্টার মেজাজে বলেছেন, বোম্বাই-এর কথা কলকাতায় কেন? সে পুরোন সম্পর্ক ভুলে নতুন সম্পর্ক এখন পাতানো হচ্ছে কি বলেন মিস জাভেরী?

মিস জাভেরী গায়ে পড়া রসিকতা কতটা পছন্দ করেছে তার মুখ দেখে বোঝা যায় নি, কিন্তু সে সরাসরি কাজের কথায় নেমেছে।

ভেতরে আসবার সময় সঙ্গের বাক্সটা সে নিজেই বয়ে এনেছিল। কাউণ্টারের কর্মচারী চাইলেও তাকে বইতে দেয় নি।

ঘরে এসে বসবার পর নিজের সামনে টেবিলের ওপরই বাক্সটা সে রেখেছিল। এবার সে বাহারে বাক্সটার ডালা খুলে একটা আশ্চর্য জিনিস বার করেছে।

একটা অত্যন্ত বিরল প্রাচীন যুগের অলঙ্কার। মিস জাভেরী তার ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণে নাম বলেছে ভদ্রিকা। নাম যাই হোক অলঙ্কারটা সত্যিই অপরূপ। বিশেষ করে তার মণিরত্নগুলি বসাবার কৌশল অপরূপ।

মিস জাভেরীর ডালা খোলা বাক্সে এই ভদ্রিকার মত আরো কয়েকটি অলঙ্কার দেখা গেছে ওপর থেকেই। সেই সঙ্গে কিছু চুনি পান্না হীরে গোছের পাথর যা অত্যন্ত দামী বলেই মনে হয়েছে।

ভদ্রিকা নামের অলঙ্কারটি একটু ভালো করে দেখবার জন্যে যুগলভাই হাত বাড়িয়েছিলেন কিন্তু দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। তার আগেই মনুভাই সেটা নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেছেন,—এ রকম প্রাচীন অলঙ্কার আপনি পেলেন কোথায় মিস জাভেরী!

মিস জাভেরী তাতে জানিয়েছে যে দিল্লীর এক পাঁচ পুরুষের বনেদী জহুরার কাছে এ জিনিষ সে পেয়েছে।

বাক্স থেকে আর একটি অলঙ্কার বার করে দেখিয়ে সে তারপর বলেছে যে ভদ্রিকাটির মত অত প্রাচীন হোক না হোক ক্ষতি নেই, তার হাতের জিনিসটির মত ভারতীয় অলঙ্কারশিল্পের বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে এমন অলঙ্কার সে চায়। প্যারিসের প্রদর্শনীতে সেই ধরনের জিনিসের কদর হবে।

মিস জাভেরী এবার যে গয়নাটি বার করেছিল সেটি পরীক্ষা করবার সুযোগ যুগলভাই পেয়েছেন। দামী পাথর বসানো একটি চূড়। বারাণসীর স্বর্ণশিল্পের উঁচু দরের কাজ।

যুগলভাই সে কাজের তারিফ করেছেন আর তারপর মিস জাভেরীর অনুরোধ রাখতে তাঁদের নিজেদের ওই ধরনের অলঙ্কারের সংগ্রহ নিয়ে আসতে বলেছেন এ বিভাগের কর্মচারীকে।

কর্মচারী দুটি বাক্সে সে সংগ্রহ টেবিলের ওপর এনে রেখে যাবার পর মিস জাভেরী তার একটি দুটি অলঙ্কার তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষায় খুশি হয়ে একটি গলার হার সে নিজের বুকের ওপর রেখে তার কারুকার্যটা ভালো করে লক্ষ্য করবার জন্যে সেই ঘরের এক ধারে আয়নার কাছে যাবার জন্যেই বোধহয় উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সেই সময়েরই তার হাত থেকে ফসকে হারটা পড়ে গেছে নিচের মেঝের ওপর।

মেঝেয় মোটা কার্পেট পাতা। হারটা সুতরাং নরম কার্পেটের

www.boiRboi.blogspot.com

ওপর হাল্কাভাবেই পড়েছে। সেটা তখনই মেঝে থেকে তুলেও দিয়েছেন মনুভাই।

যুগলভাই সেটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে কিন্তু একটু অস্থির হয়েছেন।

পুরোনো গয়না, একটা আলগা পাথর কি করে তা থেকে খসে গিয়েছে!

পাথরটা অবশ্য এক রত্তি একটা পান্না। তবু সেটা না পেলে হারটার খুঁত হয়ে যাবে।

মিস জাভেরী অত্যন্ত অপ্রস্তুত লজ্জিত হয়ে মেঝেয় কার্পেটের ওপর পাথরটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার সাহায্যে যুগলভাই মনুভাইও লেগেছেন। মনুভাই-এর চেষ্টা একটু বেশী আন্তরিক বলেই ব্যাকুলতা একটু বেশী। তাই তিনিই সবার আগে পান্নাটা খুঁজে পেয়েছেন মিস জাভেরীর শাড়ির ভাঁজের মধ্যে। পাথরটা খুঁজে পেতে মিনিট খানেকও সবশুদ্ধ লাগে নি।

মিস জাভেরী তার অসাবধানতার জন্য মাপ চেয়েছে।

যুগলভাই ও মনুভাই দুজনেই তাকে জানিয়েছেন যে মাপ চাইবার মত কিছুই হয় নি।

মিস জাভেরী এর পর যে কটি গহনা তার পছন্দ সেগুলি দেখিয়ে দিয়ে মোট মাট সেগুলির একটা দাম জানতে চেয়েছে এবং দাম জানবার পর সন্তুষ্ট হয়ে সেই দিনই বিকেলে এসে গহনাগুলো নিয়ে যাবে বলে তার বাক্সটা হাতে নিয়ে বিদায় নিয়েছে।

মনুভাই-এর পক্ষে এবার যেটা স্বাভাবিক ছিল তা কিন্তু তিনি করেন নি। দোকানের মাঝখানে ব্যাপারটা একটু বেশী বিসদৃশ দেখাবে বুঝে কিংবা সকাল থেকেই রং চড়িয়ে থাকার দরুন নিজের পায়ের ব্যালেন্সের ওপর খুব বিশ্বাস না থাকায় মিস জাভেরীকে গাড়ি পর্যন্ত আর পৌঁছে দেবার চেষ্টা মনুভাই করেন নি।

তার বদলে মিস জাভেরী চলে যাবার পর ছোট ভাইএর

বিরুদ্ধে নালিশের সুরে বলেছেন,—একেবারে গলাকাটা দাম হাঁকলে ত ?

যুগলভাই তখন দোকানের ও অফিসের 'ইনটারকম' ফোনে মেয়েটির গাড়ির নম্বরটা আর কোথায় যায় দেখে আসবার নির্দেশ দিচ্ছেন প্রধান গুপ্ত প্রহরীকে।

নির্দেশ দেওয়া শেষ করে মনুভাইএর কথার জবাবে একটু অপ্রসন্নভাবে বলেছেন,—গলাকাটার বদলে জলের দামে দিতে চাইলেও ওই মিস জাভেরী আর আসত মনে করছ ? এসব খদ্দের আমি চিনি। শুধু চাল দেখিয়ে বেড়ানো। তুমি নেহাৎ মেয়ে শুনলেই গলে যাও তাই, নইলে আমি এ ঘরে ওঁকে খাতির করে এনে বসাতাম ভেবেছ !

কিন্তু তুমি ওর পেছনে গোয়েন্দা লাগালে কেন ?—বেশ একটু অপ্রসন্নভাবেই বলেছেন মনুভাই।

গোয়েন্দা লাগাই নি, তোমার ভাবনার কিছু নেই।—যুগলভাই আশ্বস্ত করেছেন বড় ভাইকে,—শুধু গাড়িটার নম্বর আর কোন দিকে যায় একটু দেখে আসতে বলেছি। অন্যায় কিছু করেছি কি ? মিস জাভেরীর মত মেয়ের খোঁজ-খবর একটু নিয়ে রাখা ত ভালো। তোমারই কাজে লাগতে পারে।

মিস জাভেরী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনুভাই অফিস ঘরের আলমারী থেকে বোতল গেলাস বার করে মৌতাত শুরু করে দিয়েছিলেন। অফিসে তাঁর খেয়ালমত শুভাগমনের জন্যে এসব সর্বদা মজুত থাকে।

ছোট ভাই-এর বিদ্রূপের জবাবে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে তিনি বলেছেন,—দেখি তোমার ধুরন্দর গোয়েন্দা কি খোঁজ-খবর আনে।

ধুরন্ধর গোয়েন্দা কোনো খোঁজ-খবরই কিন্তু আনতে পারেন নি। গোয়েন্দার নাম মিঃ ঘোষাল। গোয়েন্দা হিসেবে তিনি কাঁচা

আনাড়ি ত ননই বরং রীতিমত অভিজ্ঞ পাকা লোক। আসলে পুলিশের কাছ থেকেই তাঁকে পাওয়া। পুলিশ বিভাগ থেকে গাফিলতি কি অক্ষমতার জন্যে কাজ তাঁর যায় নি। কলকাতা থেকে বদলী হতে চান না বলে মিঃ ঘোষাল নিজেই সসম্মানে চাকরী ছেড়ে মনুভাই যুগলভাই-এর বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে এ কাজের জন্যে মনোনীত হয়েছেন।

মিঃ ঘোষাল যুগলভাই-এর নির্দেশ পেয়ে গাড়ির নম্বর ও কোন দিকে তা যায় জেনে আসবার জন্যে মিস জাভেরীকে অনুসরণ করেছিলেন।

বাইরে বেরিয়ে কিন্তু তিনি দস্তুরমত ফাঁপরে পড়েছেন। তাঁর তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। কি করবেন ঠিক করতেই তাঁকে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে।

মেয়েটি তার গাড়িতে গিয়ে উঠবে আর মিঃ ঘোষাল গাড়িটার পরিচয় ও নম্বর নিয়ে কোন দিকে সেটা যায় তা দেখে এসে যুগলভাইকে জানাবেন এই কথা ছিল। কিন্তু সোজা ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে একটি কারণে।

তাঁদের দোকানের কাছেই যে ছোট একটা পার্কিং লট আছে তার মধ্যে মেয়েটি যে গাড়িতে এসেছিল বলে জানেন তার কোন চিহ্নই নেই।

মেয়েটি সেদিকে যায়ও নি। হাতের বাক্সটা নিয়ে মনুভাই যুগলভাই-এর দোকান থেকে বেরিয়ে সে পাশের ফুটপাথ দিয়ে খানিক দ্রুতপদে হেঁটে গিয়ে রাস্তার একটা গলিতে চট করে ঢুকে গেছে।

দোটানায় পড়ে ঘোষালের অবস্থা তখন শোচনীয়। মেয়েটির এই অদ্ভুত আচরণের পর তার ওপর নজর রাখাই উচিত বলে মনে হয়। তা করতে গেলে মেয়েটি যে কোনো গাড়িতে না উঠে হেঁটেই চলে গেছে এ অদ্ভুত খবরটা যুগলভাইকে তখুনি জানান যায় না।

যুগলভাই সে খবর না পেয়ে ঘোষালের দেরী দেখে রাগ করতেও পারেন।

তবু যুগলভাই-এর রাগের ঝক্কি নিয়ে মেয়েটির অনুসরণ করবেন বলেই স্থির করেছেন ঘোষাল।

দ্রুত পা চালিয়ে গলিটিতে ঢুকে মেয়েটির দেখা তিনি পেয়েছেন। গলির অন্য মুখ দিয়ে আরেকটি বড় রাস্তায় পড়ে সে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে।

ঘোষালকে ছুটে গিয়ে তার কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করতে হয়েছে এবার।

মেয়েটির ব্যবহার তখন তাঁর রীতিমত সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। অত বড় গাড়ি থেকে নেমে ওরকম চেহারা পোশাকে, সঙ্গে উর্দিপরা বেয়ারা নিয়ে যে মেয়ে দোকানে ঢোকে সে হঠাৎ নিজেই একটা বাক্স বয়ে এ রাস্তায় সে রাস্তায় হেঁটে ছোটাছুটি করছে কেন?

শুধু কি হেঁটে ছোটাছুটি? মেয়েটি হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে বসেছে।

কি ভাগ্যি, ঘোষাল ট্যাক্সির নম্বরটা দেখে নেবার মত কাছাকাছি ছিলেন। আর একটা ট্যাক্সি পেতে তাঁর দেরী হলেও শেষ পর্যন্ত পর পর দু-দুটো ট্রাফিক সিগন্যালের কল্যাণে দূর থেকে লক্ষ্য করবার মত ট্যাক্সিটার নাগাল তিনি ধরতে পেরেছেন। ধরতে পেরেছেন প্রায় শেষ সময়ে। কারণ মেয়েটি লাল আলোয় থেমে-থাকা গাড়ির ভেতর থেকেই তখন নেমে রাস্তার ফুটপাথে গিয়ে উঠেছে।

ঘোষালের ওপর ভাগ্যের অনুগ্রহ ওইখানেই শেষ।

এর পর ঘোষালকে কিছুক্ষণ শহরের এ কোণ থেকে ও কোণ চরকি পাক খাইয়ে নাকের জলে চোখের জলে করে মেয়েটি এক সময়ে তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিপাত্তা হয়ে গেছে।

দিশাহারা হয়ে ঘোষাল কাছাকাছি যে পাবলিক ফোনবুথ পেয়েছেন সেখান থেকে যুগলভাইকে ফোন করেছেন দোকানে।

দোকানে মনুভাই যুগলভাই দু ভাই-ই তখনো উপস্থিত।

ঘোষালের ফোন পেয়ে যুগলভাই অবাক হয়ে গিয়েছেন। ঘোষালকে তিনি শুধু বাইরে থেকে মিস জাভেরীর গাড়ির নম্বরটা জেনে আসতে বলেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেও ঘোষাল ফিরে এসে তাঁকে কোনো খবর না দেওয়ায় তিনি প্রথমটা বেশ একটু বিরক্ত হয়েই ঘোষাল অতক্ষণ পর্যন্ত কি করছে দেখে আসবার জন্যে আর একজনকে পাঠিয়েছেন। সে ফিরে এসে জানিয়েছে যে ঘোষালকে বাইরে সে দেখতেই পায় নি। এ খবরে বেশ চটে ওঠার সঙ্গে যুগলভাই একটু উদ্বিগ্নই হয়েছেন।

মনুভাই অবশ্য তাঁর অত অস্থির হওয়া দেখে হেসেছেন। বলেছেন, গোয়েন্দা হলেও পুরুষমানুষ ত! তোমার হুকুমে ওরকম মেয়ের শুধু গাড়ির নম্বর নিয়েই ফিরে আসতে পারে! ভাব জমাতে হয়ত বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। তোমার অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

ঘোষালের এই ফোন আসবার পর যুগলভাই-এর মুখের চেহারা দেখে মনুভাই আর তামাশা অবশ্য করেন নি।

ভুরু কুঁচকে একটু উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন,—কি হয়েছে কি? অ্যাকসিডেন্ট ট্যাকসিডেন্ট।

না।—যুগলভাই চিন্তিত মুখে বলেছেন,—কিন্তু ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত! ঘোষালকে তখনই দোকানে চলে আসতে বলে ফোন নামিয়ে ঘোষালের কাছে যা শুনেছেন যুগলভাই দাদাকে সংক্ষেপে তা জানিয়েছেন।

সব শুনে এবার কিন্তু হেসে উঠেছেন মনুভাই। বলেছেন,—বাঃ—বাহাদুর মেয়ে বলতে হবে। আমি ত দেখছি তোমার গোয়েন্দাকে ইচ্ছে করে ঘোল খাইয়েছে।

ইচ্ছে করে ঘোল খাইয়েছে!—যুগলভাই চটে উঠে বলেছেন,—এরকম ইচ্ছের কারণ?

কারণ আর কি?—মৌতাতের দরুন মনুভাই-এর কথাগুলো জড়ানো হলেও মাথাটা খুব সাফ দেখা গেছে—অত্যন্ত চালাক মেয়ে ত! তোমার গোয়েন্দা ওর পিছু নিয়েছে বুঝে পিছু নেওয়ার মজাটা ভালো রকম বুঝিয়ে দিয়েছে! দেখিয়ে দিয়েছে যে ধড়িবাজ গোয়েন্দার চেয়ে সে এক কাঠি সরেস। গোয়েন্দা যদি ডালে ডালে যায় তাহলে পাতায় পাতায় যাবার ক্ষমতা সে রাখে! সত্যি তারিফ করতে হয় অমন মেয়ের!

যুগলভাই কিন্তু মেয়েটিকে তারিফ করে ব্যাপারটার ওখানেই ইতি করতে পারেন নি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় তাঁদের নিজেদের সাবেকী গহনার নমুনার বাক্স দুটো তিনি একজন কর্মচারীকে আর একবার নিয়ে আসতে বলেছেন। মিস জাভেরী চলে যাওয়ার পর সে দুটি বাক্স তিনি তুলে রাখিয়েছিলেন।

কর্মচারী বাক্স দুটি আবার বার করে টেবিলে এনে রেখে গেলে পর পর দুটি বাক্সের ডালা খুলে দেখতে গিয়ে তিনি চমকে গেছেন।

দোকানে হুলস্থুল বেধেছে তারপর। যে দুটি বাক্স কর্মচারী এনে দিয়েছে তার একটির জড়োয়া গয়নাপত্র থেকে দামী পাথরটাথর সব মিস জাভেরী যা দেখিয়েছিলেন তাই।

এ ব্যাপার কি করে সম্ভব?

দোকানের আর মিস জাভেরীর গয়নার বাক্স বদলও হয় নি। বাক্সগুলির মধ্যে এমন মিল নেই যে, ভুল করে একটার বদলে আর একটা চলে যেতে পারে! মিস জাভেরীর গয়নার বাক্স সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। যাবার সময় সে নিজের বাক্সই নিয়ে চলে গেছে।

তাহলে তার জিনিষপত্র অন্য বাক্সে এল কি করে?

www.boiRboi.blogspot.com

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সিস জাভেরীর গহনা আর পাথরগুলো যুগলভাই তখনই পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করিয়েছেন।

পরীক্ষার পর তাঁর সন্দেহই নির্ভুলভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মিস জাভেরীর সব গহনা নকল মেকী আর সব পাথর ঝুটো!

তার বদলে মিস জাভেরী দোকানের বাক্সের যা নিয়ে গেছে সেসব বিরল আর বাছাইকরা জিনিসের দাম কমপক্ষে লাখ দুয়েক।

ব্যাপারটা সত্যিই ভোজবাজির মত অবিশ্বাস্য। মিস জাভেরী কেমন করে এরকম বদলাবদলীটা করেছে ভেবে কোনো কূলই পাওয়া যায় নি।

বোম্বাই-এর যে জুয়েলারী ফার্মের চিঠি নিয়ে মিস জাভেরী এসেছিল তখনই তাদের অফিসে ট্রাঙ্ককল বুক করা হয়েছে সোজা-সুজি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

ইতিমধ্যে ঘোষাল এসে অফিসে পৌঁছে গেছেন। তাঁর কাছে আরো বিস্তারিত বিবরণ শুনে কি করা উচিত তা নিয়ে গোপনে আলোচনা হয়েছে।

প্রথম ব্যাপারটা তখনই পুলিশে জানাতে চেয়েছিলেন যুগলভাই। মনুভাই আর ঘোষাল দুজনেই তার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন।

পুলিশে জানালে ব্যাপারটা সাধারণের কাছে আর গোপন রাখা যাবে না। খবরের কাগজেও এমন একটা মুখরোচক উত্তেজনার খোরাক নিশ্চিত জায়গা পাবে। তাতে দোকানের মিনিমাগনা প্রচার হবে ঠিকই কিন্তু সে প্রচারে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। মনুভাই যুগলভাই-এর দোকান লোকে নামকরা ব্যাঙ্কের মত নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস ভাঙতে দেওয়া উচিত নয়।

তাছাড়া পুলিশের কাজ নিপুণ নিখুঁত হতে পারে কিন্তু খুঁটিনাটি

সবকিছু ধরে তাদের কাণ্ডকারখানা এলাহি বলে তাদের আঠারো মাসে বৎসর।

এ ব্যাপারটার মীমাংসা শুধু নিঃশব্দে গোপনে নয়, তাড়াতাড়ি যাতে হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

ঘোষাল এ কাজের জন্য পরাশর বর্মার সাহায্য নেবার কথা তুলেছেন। মনুভাই পরাশর বর্মার নাম শোনেন নি। উৎসাহ না দেখালেও আপত্তি তেমনি কিছু তিনি তোলেন নি।

সামান্য একটা ব্যাপারে যুগলভাই-এর সঙ্গে পরাশরের আগে বুঝি একবার পরিচয় হয়েছিল। যুগলভাই ঘোষালের পরামর্শে সায় দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে বোম্বাই-এর ট্রাঙ্ক কনেকশন পাওয়া গেছে।

ট্রাঙ্ককলে বোম্বাই-এর জহুরী কোম্পানীর সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে তা তখন আর অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

বোম্বাই-এর সে কোম্পানী মিস জাভেরী বলে কাউকে পরিচয়-পত্র দেওয়া দূরে থাক ও নামের বা ওই চেহারায় কাউকে চেনেই না। তাদের ম্যানেজারের বলে যে সই ও চিঠিতে আছে সে সই নিশ্চিত জাল।

এই খবরই পাওয়া যাবে অবশ্য ট্রাঙ্ককল বুক করবার সময়েই বোঝা গেছল।

বোম্বাই-এর জহুরী কোম্পানীর ব্যাপারটা পরিষ্কার হবার পর মিস জাভেরীর এখানকার চোখে ধুলো দেবার কৌশলটা বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরাশরকে তার খিদিরপুরের বাসায় ফোন করে একবার মনুভাই যুগলভাই-এ আসবার অনুরোধ জানিয়ে তার কাজটা এগিয়ে রাখবার জন্যে ঘোষালই প্রথমে যে গাড়ি থেকে মিস জাভেরী নেমেছিল তার হদিস পাবার চেষ্টা করেছেন।

দোকানের যে দুএকজন কর্মচারীর মুখে মিস জাভেরী একটা খুব

দামী বড় গাড়ি থেকে নেমেছিল বলে ভাসাভাসা ধারণার কথা আগে শোনা গিয়েছিল, ভালোভাবে জেরা করবার পর দেখা গেছে যে তারা কেউ গাড়িটাকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে নি।

www.boiRboi.blogspot.com

একটা খুব দামী গোছের মস্ত লম্বা গাড়ির দোকানের সামনে আসার আর সঙ্গে উর্দিপরা বেয়ারা নিয়ে একটু অসাধারণ চেহারা পোশাকের একটি মেয়ের দোকানে ঢোকার ঝাপসা ছবিই তাদের মনে আছে।

সে ছবিতে গাড়ির চেয়ে মেয়েটিই বেশী স্পষ্ট। গাড়িটা আবছাভাবে শুধু মনে আছে মাত্র।

গাড়ির রহস্যটার মীমাংসা অপ্রত্যাশিতভাবে তখনই হয়ে গেছে। মীমাংসা করে দিয়েছে মিস লীনা।

মনুভাই যুগলভাই-এর দোকানের ঠিক উল্টোদিকে রাস্তায় অন্যপারে কলকাতার একটি নামকরা বই-এর দোকান। লীনা সেখানে একটা বই-এর খোঁজে এসেছিল খানিক আগে। সে বইটা কিনে আর তারপর আর কয়েকটা বই ঘেঁটে সেখান থেকে বেরিয়ে সে ওখানকার একটা রেস্তোরাঁয় একটু কফি খেয়ে একটা ট্যাক্সি করে তার বাসাতেই ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে যে বইটা সে কফি খাবার পর রেস্তোরাঁর টেবিলেই ভুলে ফেলে এসেছে।

ট্যাক্সি ঘুরিয়ে সে রেস্তোরাঁয় এসেছে বইটার খোঁজে কিন্তু বইটা পাওয়া যায় নি। রেস্তোরাঁর কোনো বয় সেটা দেখেও নি বলেছে।

মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর সঙ্গে পয়সা বেশী না থাকায় সে এবার মনুভাই যুগলভাই-এর দোকানে এসেছে যুগলভাই-এর কাছে কিছু পয়সা নেবার জন্যে।

এসে একেবারে উত্তেজনার ঘূর্ণির মধ্যেই পড়েছে বলা যায়।

ঘোষাল তখন কর্মচারীদের মিস জাভেরীর গাড়িটা সম্বন্ধেই

জিজ্ঞাসাপত্র করছেন। সকলের অস্পষ্ট জবাবে একটু বিরক্তও হয়ে হয়ে উঠেছেন যুগলভাই ও ঘোষাল।

আসল ব্যাপারটা ইতিমধ্যে সংক্ষেপে লীনার শোনা হয়ে গেছে।

ঘোষালের জেরার মাঝখানে বাধা দিয়ে সে এবার বলেছে ওদের আর মিছামিছি কষ্ট দেবেন না। গাড়ির ব্যাপারটা আপনারা যা মনে করছেন তা সম্পূর্ণ ভুল।

তার মানে?

ঘোষালের সঙ্গে যুগলভাই আর মনুভাইও সবিস্ময়ে লীনার দিকে চেয়েছেন।

তার মানে!—লীনা জবাব দিয়েছে একটু নাটকীয়ভাবেই,—মিস জাভেরী যার নাম বলছেন সে মেয়েটি কোন গাড়িতেই বোধহয় আসে নি।

তুমি কি করে জানলে?—একটু সন্দিগ্ধভাবেই জিজ্ঞাসা করেছেন মনুভাই।

বাঃ, আমি নিজের চোখে দেখলাম যে! বলেছে লীনা।

নিজের চোখে, কিরকম?—এবার যুগলভাইও কৌতূহলী হয়েছেন।

তখন আমি ওপারের বই-এর দোকানে ঢুকছি। লীনা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছে,—এ দোকানের সামনে একটা কাডিল্যাক দাঁড়াতে দেখে আপনা থেকেই চোখটা সে দিকে গেছে, অমন গাড়িতে কে এল জানবার জন্যে। গাড়িটা কিন্তু কাউকে নামাবার জন্যে ওখানে থামে নি। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া কেউ ছিলও না।

কেউ যখন ছিল না, তখন গাড়িটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল কেন? জেরা করেছেন যুগলভাই।

দাঁড়িয়েছিল ত দু-তিন সেকেণ্ডের জন্যে,—লীনা ব্যাখ্যা করেছে —সামনে একজন পড়েছিল বলে ড্রাইভার গাড়িটা রুখেছিল।

একটু থেমে লীনা ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলেছে, হ্যাঁ এইবার মনে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়েছে! একটি বেশ স্মার্ট ফ্যাশানেবল লেডীকে গাড়ির সামনে থেমে পড়ে তারপর দোকানের দিকে যেতে দেখেছি।

স্মার্ট ফ্যাশানেবল্ লেডীকে দেখেছ! মনুভাই একটু ঠাট্টার সুরে বলেছেন—স্মার্ট ফ্যাশানেব্‌ল বললে কিছুই বোঝা যায় না। স্মার্ট ফ্যাশনেব্‌ল লেডী ত তুমিও।

না, না, আমি আবার কি ফ্যাশানেব্‌ল স্মার্ট!—লীনা লজ্জা পেয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলেছে, নেহাৎ গাঁইয়া পাছে কেউ ভাবে তাই একটু ভদ্র সাজপোশাকের চেষ্টা করি মাত্র। গাড়ির সামনে দিয়ে যাঁকে যেতে দেখেছি তাঁর সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না। সাজপোশাক চলনে-বলনে তিনি অনেক ওপরের মহলের।

ওপরের মহলের!—মনুভাই হেসে উঠেছেন, তুমি যদি জাভেরীকে দেখে থাকো, আর তাই দেখেছ বলেই মনে হচ্ছে তাহলে তাকে ওপরের মহলেরই বলা উচিত বটে।

একটু থেমে ভুরু কুঁচকে যেন পরীক্ষার ছলে মনুভাই আবার বলেছেন,—আচ্ছা তুমি ত কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মাত্র মেয়েটিকে দেখেছ, তাতে তার কি বিশেষত্ব সবচেয়ে তোমার চোখে পড়েছে বলো ত?

সোনালী গোছের চুলের খোঁপা—উত্তর দিতে দেরী হয় নি লীনার।

ঠিক! ঠিক! যুগলভাই খুশি হয়ে সায় দিয়েছেন,—আজকাল যে মাথার ওপর উইঢিবির মত কি এক বিদঘুটে খোঁপা হয়েছে, তাই। একে সোনালী চুল তার ওপর ওই বদখদ খোঁপা, প্রথমে ওইটেই চোখে পড়তে বাধ্য। তুমি মিস জাভেরীকেই দেখেছ এ বিষয়ে ভুল নেই।

তার বড় গাড়িতে আসাটাও তাহলে মিথ্যে! ঘোষাল চিন্তিত ভাবে বলেছেন এবার,—বেশ তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁত ভাবে প্ল্যান করা। সঙ্গে উর্দিপরা বেয়ারা নিয়ে চোখে ধূলো দেবার কায়দাটাও অদ্ভুত বলতে হবে!

www.boiRboi.blogspot.com

আপনি যে রকম তারিফ করছেন,—মনুভাই ঘোষালকে খোঁচা দিয়ে এবার বলেছেন, তাতে মিস জাভেরীকে পেলে একটা মেডেলই দেবেন মনে হচ্ছে। আমাদের ইচ্ছেটা কিন্তু আলাদা। আমরা তাকে ধরতে চাই।

তার ব্যবস্থাই হচ্ছে।—ঘোষাল খোঁচাটা অগ্রাহ্য করে বলেছেন, পরাশর বর্মা এখুনি আসছেন। তিনি এ ব্যাপারটার কিনারা করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

তিনি লবডঙ্কা করবেন! অবজ্ঞাভরে বলে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠেছেন মনুভাই। তারপর লীনার দিকে ফিরে বলেছেন,—চলো তোমায় পৌঁছে দিই। এসব তুচ্ছ টিকটিকির জন্যে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

লীনা তার একটু দরকার আছে বলে মনুভাই-এর সঙ্গে যাওয়াটা কাটাতে চেয়েছে। কিন্তু মনুভাই একেবারে নাছোড়বান্দা।

বলেছে,—কি আবার তোমার এখানে দরকার? যুগলভাই-এর কাছে যদি কিছু যদি দরকার থাকে, তাহলে আমিই তা মেটাতে পারব।

লীনা একটু অসহায় ভাবে যুগলভাই-এর দিকে চেয়েছে।

জোর করে ওকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?—বলে যুগলভাই একটু প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু ফল কিছু হয়নি।

মনুভাই প্রতিবাদটা উড়িয়ে দিতে রসিকতা করে বলছে মেয়েদের ওপর জোরই করতে হয় বুঝেছ।

ঘোষাল না বাধা দিলে লীনার তখনই মনুভাই-এর সঙ্গে না গিয়ে বোধহয় উপায় থাকত না।

ঘোষাল বাধা দিয়েছেন 'কেস'টার দোহাই দিয়ে। বলেছেন—পরাশর বর্মা এখুনি এসে পড়বেন। যা দেখেছেন তা নিজের মুখে বলবার জন্যে লীনা দেবীর এখানে থাকা দরকার। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আপনারও থাকা দরকার মনুভাই-জি!

www.boiRboi.blogspot.com

হ্যাং ইওর পরাশর!—বলে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে মনুভাই দোকান থেকে বেরিয়ে গেছেন।

মনুভাই যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে পরাশর।

পরাশর সকলের কাছে সব বিবরণ শুনে শুধু দুটি প্রশ্ন করেছে।

লীনাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ক্যাডিল্যাক গাড়িটার সামনে মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কি-না।

একটু মনে করবার চেষ্টা করে লীনা বলেছে—থমকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

যারা যারা মিস জাভেরীকে দেখেছে তাদের সকলকে আরেকটা প্রশ্ন করেছে পরাশর।

জানতে চেয়েছে, তারা কেউ মিস জাভেরীর মাথায় সোনালী চুলের ঘটি-খোঁপা ছাড়া আর কিছু চেহারা পোশাকের বিশেষত্ব লক্ষ করেছে কি না?

কি রকম বিশেষত্ব? জিজ্ঞেস করে একটু হেসে বলেছেন যুগলভাই, সুন্দরী মেয়ের সব কিছুই ত বিশেষত্ব! মাথার সোনালী চুলের মত গায়ের মেমেদের মত রঙ, চমৎকার গড়ন, আর……

বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছেন যুগলভাই।

থামলেন কেন? বলুন।—তাঁকে উৎসাহ দিয়েছে পরাশর,—আর কি বলতে গিয়ে দ্বিধা করছেন?

আর তার গলার স্বর?—যুগলভাই এবার কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই যেন বলেছেন,—গলার স্বরটা তার চেহারার সঙ্গে মানায় না একটু,—একটু যেন তোৎলাও।

তোৎলা শুনেই পরাশরের মুখটা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা লীনার ভালোরকম মনে আছে।

সে একটু অবাক হয়েই তখন জিজ্ঞাসা করেছে, মিস জাভেরী তোৎলা শুনে আপনার খুব যেন সুবিধে হল মনে হচ্ছে! এটা কি খুব দামী খবর?

দামী নয়!—পরাশর সোৎসাহে জানিয়েছে,—এই একটা খবরেরই দাম লাখ টাকা!

তার মানে,—এবার না হেসে পারেন নি যুগলভাই—আপনি দেশের সব সুন্দরী মেয়েদের তোৎলা কিনা পরীক্ষা করে বেড়াবেন!

কাজটা অমন আজগুবি ভাবছেন কেন?—পরাশর গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছে—আপনাদের বর্ণনা যা শুনলাম তাতে মিস জাভেরীর মত সুন্দরী মেয়ে লাখে লাখে আছে বলে ত মনে হয় না। তাছাড়া তাকে মাঠে ঘাটে গাঁয়ে ত খুঁজতে হবে না। কলকাতা দিল্লী বোম্বাই-এর মত কটা বড় শহরের 'হাই সোসাইটি' যাকে বলে সেখানেই একটু সজাগ হয়ে সন্ধান চালালে তার হদিস পাওয়া অসম্ভব নয়।

যুগলভাই-এর চোখের দৃষ্টিতে পরাশরের গোয়েন্দাগিরির দৌড় সম্বন্ধে একটু সন্দেহের ছায়া হয়ত তখন দেখা দিয়েছিল। তিনি অবশ্য সেটা ঠাট্টার ছলেই প্রকাশ করে বলেছেন—মিস জাভেরীকে তাহলে ত ধরেই ফেলেছেন মনে হচ্ছে!

পরাশর কিন্তু ঠাট্টার ধার দিয়েও না গিয়ে যেন সোজা প্রশ্নের জবাবে গম্ভীরভাবে বলেছে, না, ধরে এখনও ফেলিনি, তবে আশা রাখি। এখন শুধু একটা পরীক্ষা করতে পারলে ভালো হয়।

কি পরীক্ষা?—জিজ্ঞেস করেছেন ঘোষাল।

ঘোষালকে বেশ একটু অপ্রস্তুত করে পরাশর আমার যাতে এত হয়রানি সেই অদ্ভুত খেয়ালটাই জানিয়ে বলেছে,—আপনি যাতে হার মেনেছেন সেই কাজই হাসিল করা যায় কিনা তার পরীক্ষা।

কিরকম?—একটু কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন যুগলভাই,—মিস জাভেরীকে দোকান থেকে বার হবার পর শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা যায় কি না পরীক্ষা করবেন আবার? মিস জাভেরীকে ফোনে ডাকলেই তিনি আসবেন বুঝি?

এবার পরাশরও হেসেছে। হেসে রসিকতার মেজাজেই

www.boiRboi.blogspot.com

বলছে,—তা তিনি যেরকম 'স্পোর্টিং' মেয়ে মনে হচ্ছে তাতে ফোন পেলে আসতেও পারতেন হয়ত। নেহাৎ ফোন নম্বরটা জানা নেই, তাই।

তাহলে কি করবেন?—কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করেছেন যুগলভাই।

মিস জাভেরীর জায়গায় আর কাউকে নিতে হবে! এই লীনা দেবীই আমাদের সে অনুগ্রহটা করতে পারেন।—বলেছে পরাশর।

লীনা সলজ্জ হলেও প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে,—না, না আমি মিস জাভেরীর জায়গা নেব কি! সে আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাকে হাত তুলে থামিয়ে যুগলভাই বলেছেন,—থামো, লীনা থামো। আচ্ছা ধরুন লীনাই মিস জাভেরীর বদ্‌লী হয়ে দোকান থেকে পালাল। তাকে ঘোষালের জায়গায় অনুসরণ করবে কে? আপনি?

না।—পরাশর হেসে জানিয়েছে,—আমার সে ক্ষমতা নেই। অনুসরণ করবার জন্যে আমার এক বন্ধুর কথা ভাবছি।

যার কথাই ভাবুন,—যুগলভাই এবার জোর দিয়ে টেবিলে চাপড় মেরে বলেছেন,—ঘোষাল এককালের ঝানু পুলিশ গোয়েন্দা হয়ে যা পারেন নি তা আর কারুর সাধ্য নয়। আমি পাঁচশ টাকা বাজি ধরতে রাজী আছি।

পাঁচশ টাকা বাজীই আমি ধরলাম।—পরাশর হেসে বলেছে,—আমার বন্ধু মিঃ ভদ্রের নজর এড়িয়ে লীনা দেবী কিছুতেই গা ঢাকা দিতে পারবেন না। আপনি শুধু লীনা দেবীকে রাজী করান।

এর পর আপত্তি করা লীনা দেবীর পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। আর ফোনে পরাশরের জরুরী তলব পেয়ে আমার যা হাল হয়েছে তাত আগেই জানানো হয়েছে।

সমস্ত বিবরণটা আমায় শোনানো হবার পর লীনা মুখটা

www.boiRboi.blogspot.com

করুণ করে, আমাদের কাছে বিদায় চাইলে। কুণ্ঠিতভাবে জানালে যে তাকে এবার উঠতে হবে।

হ্যাঁ তাই যাও।—যুগলভাই বেশ একটু তিক্ত স্বরে বললেন,—ওঁকে গিয়ে সব শোনাতে হবে বলে কথা আদায় করে নিয়ে গেছেন। এখন না গেলে তোমার আর রক্ষা থাকবে না।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে লীনা বিষণ্ণ মুখে লিফ্‌টের দিকে চলে গেল। তার হাঁটার ভঙ্গিটাও এখন ক্লান্ত। অর্ধেক কলকাতা আমায় ঘোরাবার সময় তার চলা ফেরার যে সজীবতাটা লক্ষ করেছি এই ফ্ল্যাটে এসে বসবার পর তা যেন হঠাৎ উবে গিয়েছে।

ফ্ল্যাটে এসে বসবার পর নয় অবশ্য, মনুভাই এসে দেখা দেওয়ার পর থেকেই।

এই সূত্রে যা ভাবছিলাম আমার সেই মনের কথাটাই সেই মুহূর্তে পরাশরের আকস্মিক প্রশ্নে উচ্চারিত হতে শুনে একটু চমকেই উঠলাম।

লীনা তখন লিফ্‌টে ওপরে উঠে গিয়েছে। তার লিফ্‌টের আওয়াজটাও পেয়েছি।

পরাশর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা লীনা দেবীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কটা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

পারেন।—যুগলভাই একটু হেসে বললেন,—তবে জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন এটা বোধহয় নয়। লীনা দেবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জানলে এ চুরির কিনারার কোনো সুবিধে হবে কি?

তা হবে না—পরাশরের মুখে একটু তিক্ত হাসি দেখা গেল,—প্রশ্নটা গোরেন্দা হিসেবে নয় মানুষ হিসেবেই করেছি।

যুগলভাই-এর মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে মনে হল তিনি কিছুটা অপ্রসন্নই হয়েছেন এ অনধিকার চর্চায়।

তার পরমুহূর্তেই অবশ্য পরাশরের দিকটা বোধহয় বুঝে একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—আপনার এ প্রশ্ন অন্যায় বা অস্বাভাবিক আমি বলছি না। আপনি এইটুকুর মধ্যে যা দেখেছেন

www.boiRboi.blogspot.com

শুনেছেন তাতে এ প্রশ্ন আপনার মনে জাগতেই পারে। উত্তরটা তাই সহজভাবেই দিচ্ছি! লীনার সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। লীনার বাবা আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। সাধারণ কর্মচারী নয় বাবার সত্যিকারের ডান হাত বললেই হয়। বাবা থাকতেই ওই মেয়েটিকে রেখে তিনি মারা যান। লীনা আর তাঁর মার সমস্ত ভার বাবাই তারপর থেকে নিয়েছিলেন। লীনাকে কোন দিক দিয়ে কোনো অভাব বোধ করতে তিনি দেন নি। আমরা বাবার কাছে যা ছিলাম লীনাও তাই। তখন আমাদের ব্যবসার অবস্থা এখনকার মত না হলেও সে-যুগের পক্ষে যথেষ্ট ভালো ছিল। লীনা আর তার মার জন্যে বাবা একটি ছোট বাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। আমাদের নিজেদের তখনো বাড়ি হয় নি। সেই বাড়িতেই লীনা ভালোভাবে মানুষ হয়েছে। তার মা বছর-দুই আগে মারা গেছেন। লীনা বাড়ির খানিকটা অংশ ভাড়া দিয়ে সেইখানেই আছে। আমাদের দোকান থেকে বাবা ওদের জন্যে একটা মাসোহারা ব্যবস্থা করে গেছলেন। কোনো লেখাপড়া না থাকলেও সেটা আমি মানে আমরা দিয়ে যাই। চাকরি-টাকরি পছন্দমত ও এখনো পায় নি, তবে ওই মাসোহারা আর বাড়িভাড়াতেই ওর যা আয় তাতে ওর আর যে মাসী ওর সঙ্গে থাকেন তাঁদের একরকম চলে যায়।

যুগলভাই তাঁর কথা শেষ করবার পর একটু চুপ করে থেকে পরাশর বললে—আপনি এতটা বেশী করে বিবরণ দিয়ে যা চাপতে চাইলেন, তা কিন্তু আপনার এক্‌টা মুখ-ফসকানো কথাতেই ধরা পড়ে গেল যুগলভাইজি।

কি মুখ-ফসকানো কথায়?—যুগলভাই একটু প্রতিবাদের সুরেই বললেন।

ওই 'আমি' বলতে গিয়ে থেমে 'মানে আমরা' বলায়।—পরাশর

www.boiRboi.blogspot.com

একটু হেসে বুঝিয়ে দিলে, ও মাসোহারাটা আপনিই অন্যের মতের বিরুদ্ধে দিচ্ছেন।

না, না তা ঠিক নয়।—যুগলভাই তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানালেন,—ওকে মাসোহারাটা দেওয়ায় কারুর আপত্তি নেই। তবে, তবে···

যুগলভাই দ্বিধাভরে একটু থামলেন।

তবে কি? পরাশর জিজ্ঞাসা করলে।

তবে, বাবা থাকতে যা কোনদিনও বুঝতে পারেনি,—যুগলভাই আর ঢেকে রেখে লাভ নাই বলে কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলেই ফেললেন,—এখন মাঝে মাঝে সেটা বোধহয় একটু স্পষ্ট করেই টের পায়। আশ্রিতা হিসেবে অনুগ্রহ নিতে হলে একটু ছোট হয়ে মন রাখবার চেষ্টা ত করতেই হয়।

পরাশর কয়েক সেকেণ্ড কথাগুলো যেন ভালো করে বোঝবার জন্যে চুপ করে থেকে বললে,—মাপ করবেন, আর একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। আপনি আর মনুভাই কি বিবাহিত?

যুগলভাই হেসে বললেন, সত্যিই ঘোষালের কথায় আপনাকে এবার গোয়েন্দা হিসেবে ডেকে ভুল করেছি। এখন গোয়েন্দাগিরির চেয়ে ঘটকালিতেই আপনার ঝোঁক বেশী মনে হচ্ছে। আপনি ত এর পর আমাদের চোদ্দপুরুষের ঠিকুজি চাইবেন! তবু আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে আমার এখনো বিয়ে হয় নি আর ভাইজি বিপত্নীক। বছর-দুই হল ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন।

আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন এইখানেই শেষ!—বললে পরাশর, এবার যা ভেবে আমার ডেকেছেন, সেই গোয়েন্দা হিসেবেই নতুন একটা-দুটো প্রশ্ন করছি। আপনাদের কারবারে এর আগে এরকম চুরি কখনো হয়েছে কি?

না, এরকম হয় নি। যুগলভাই জবাব দিলেন, তবে ছোটখাটো একটা চুরির কথাত আপনিই জানেন। আপনাকেই সেবার

ডাকা হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমার প্রথম সামান্য পরিচয় সেই তখনই।

হ্যাঁ, পরাশর সায় দিলে, তবে আপনি ব্যাপারটা একেবারে চাপা দিলেও ছোটখাটো চুরি সেটা ছিল না। আপনাদের মত ধনীরা কি ভাবেন জানি না কিন্তু দশ হাজার আমাদের কাছে অনেক টাকা যুগলভাইজি।

যাক সে কথা যেতে দিন।—যুগলভাই প্রসঙ্গটা স্পষ্ট এড়াতে চাইলেন।

সেবারও আপনি অনুসন্ধানের মাঝপথে ব্যাপারটা হঠাৎ চাপা দিয়েছিলেন। পরাশর একটু ক্ষুণ্ণস্বরে জানালে,—সমস্ত খেই যখন আমার হাতের মুঠোয় আপনি তখন আর ব্যাপারটা নিয়ে এগুতে চান নি। সে চুরির সঙ্গে এটার কিছু সংশ্রব থাকতে পারে যুগলভাইজি?

আমি তা মনে করি না।—যুগলভাই জোর দিয়ে বললেন, তাছাড়া সামনে যা পেয়েছেন এ-চুরির রহস্যভেদের জন্যে তাই বোধহয় যথেষ্ট।

বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম। পরাশর একটু হেসে বললে, এখন মনুভাই কোথায় থাকেন যদি একটু জানান।

ভাইজি এই বাড়িরই আর একতলা ওপরে উত্তরের উইং-এ থাকে। উত্তরের দুটো ফ্ল্যাটই সে নিয়ে আছে সুতরাং খোঁজার জন্যে ফ্ল্যাট নম্বর দরকার হবে না। জানালেনই যুগলভাই।

কিন্তু মনুভাই ত বিপত্নীক বললেন!—আমিই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না,—দু-দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি কি করেন? ছেলেপুলে আছে অনেক?

না,—যুগলভাই দুঃখের হাসি হাসলেন—বিয়ের ছমাসের মধ্যে আমার ভৌজী মারা যান। সুতরাং ছেলেপুলে কোথায়! ভাইজি ওখানে একাই থাকেন। বাড়তি ফ্ল্যাটটা নিয়ে রেখেছেন ভবিষ্যতের

জন্যে। নতুন ভৌজী এলে তাঁর সম্মানে হাত-পা ছড়াবার জায়গাটা বাড়াতে হবে ত!

শেষ কথাগুলো বলবার সময় যুগলভাই-এর চোখ-মুখের প্রসন্ন কৌতুকটা লুকোনো রইল না।

তাইতেই একটু ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—নতুন ভৌজী শীগগিরই আসছেন বুঝি?

আসছেন কিনা জানি না।—যুগলভাই-এর মুখটা আপনা থেকেই কি একটু বিষণ্ণ দেখালো এবার!—তবে তোড়জোড় ত চলছে দেখতে পাচ্ছি।

আচ্ছা, মনুভাই-এর ফ্ল্যাট ত জানলাম।—পরাশর কথাটা ঘোরালে,—লীনা দেবীর বাড়ির ঠিকানাটা যদি দেন।

লীনা দেবীর ঠিকানায় কি হবে!—যুগলভাই মৃদু একটু আপত্তি জানালেন, বেচারাকে এমনিতেই যথেষ্ট কষ্ট দেওয়া হয়েছে, এর ওপর আরো জ্বালাতে চান?

না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।—পরাশর গম্ভীরভাবে বললে, পারতপক্ষে ওঁকে আর এ-ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করব না। ঠিকানাটা তবু রুটিন হিসেবে জেনে রাখতে চাই।

যুগলভাই ঠিকানাটা দেবার পর আমরা উঠে পড়েছি বিদায় নেবার জন্যে।

দাঁড়ান! দাঁড়ান! যুগলভাই হেসে অনুরোধ জানালেন, মিঃ বর্মার কাছে হারা বাজির টাকাটা দিয়ে দিই।

সেটা এখন থাক্। পরাশর হেসে বললে,—বাজির টাকা আর আমার গোয়েন্দাগিরির ফী একসঙ্গেই নেব।

তাই দেবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে রইলাম মিঃ বর্মা। যুগলভাই একটু জ্বালার সঙ্গেই জানালেন,—লোকসান যা হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু তার চেয়ে বেশী লাগছে, একটা বলতে গেলে একরত্তি মেয়ের এমন করে আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে ঠকিয়ে যাওয়া। এ

ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পাবো না।

নিষ্পত্তি শীগগিরই হবে। পরাশর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আশ্বাস দিলে,—যদি না আপনি আবার মাঝপথে আমায় থামতে বলেন।

না, না মীমাংসাটা যত অপ্রিয় হোক এবার আপনাকে থামতে বলব না।—যুগলভাই দৃঢ় স্বরে জানালেন।

এই আশ্বাসটুকুই আপনার কাছে চাইছিলাম। বলে পরাশর লিফটের দিকে পা বাড়ালে। সেই সঙ্গে আমিও।

যুগলভাই একজন পরিচারককে বোতাম টিপে ডেকেছিলেন লিফটে আমাদের নামিয়ে দেবার জন্যে। পরাশর অটোমেটিক লিফট নিজেই চালাতে পারবে বলে সে সাহায্য প্রত্যাখান করলে।

প্রত্যাখ্যান করবার কারণটা অটোমেটিক লিফটের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারলাম।

নিচে নামবার নয় পরাশর তখন ওপরে ওঠবার বোতাম টিপেছে। যুগলভাই-এর ঠিক ওপরের তলায় যাবার বোতাম।

কয়েক সেকেণ্ডেই লিফট সেখানে পৌঁছে দরজা আপনা থেকে খুলে গেল।

পরাশরের এসব বেয়াড়াপনা আমার জানা। হেসে তাই বললাম, তুমি মনুভাই-এর ফ্ল্যাটে আসতে চাও তো যুগলভাইকে জানাতে কি হয়েছিল?

জানালে 'ভাইজিকে এখন আবার বিরক্ত করবেন!' বলে সাতটা ওজর তুলতেন হয়ত। পরাশর হেসে বললে,—উনি ত চান কাউকে কিছু জ্বালাতন না করে আমি ফুসমন্তরে মিস জাভেরীকে হাজতে পুরে দিই।

তবে, একথাও বলি,—পরাশর একটু থেমে নিজের ভুল স্বীকারের ভঙ্গিতে আবার বললে,—শুধু চেহারা দেখেই মানুষকে

যে বিচার করতে নেই যুগলভাই-এর বেলা তা ভালো করেই আজ বুঝলাম।

ঠিক বলেছ! পরাশরকে সমর্থন না করে পারলাম না,—ওই কুমড়োপটাশের মত চেহারা, ঘাড়ের মাংসের থাক, তার ওপর গাড়ি, বাড়ির সঙ্গে একেবারে বেমানান গলার হার, দশ আঙুলের আংটি সমেত ওই সৃষ্টিছাড়া বাংলা শুনে লোকটাকে একটা হাঁদা সং গোছের মনে হয়েছিল প্রথম, কিন্তু পরে কথাবার্তা আর ব্যবহারে দস্তুরমত সমীহ করবার মানুষ বলে টের পেলাম। ভাঙা ভুল বাংলার বদলে নিজের ভাষা বলার সঙ্গে মানুষটাই যেন চোখের ওপর বদলে গেল।

তাহলে তুমিও তা লক্ষ্য করেছ? বলে আর কি যেন একটা জানাতে গিয়ে পরাশরকে হঠাৎ থামতে হল।

আমিও তখন সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

লিফট থেকে বেরিয়ে চওড়া করিডর দিয়ে তখন আমরা মনুভাইয়ের জোড়া ফ্ল্যাটের একটি দরজার সামনে এসে উপস্থিত।

আধুনিক ফ্ল্যাট হলেও কিংবা বলা উচিত বোধহয় আধুনিক ফ্ল্যাট বলেই দেয়াল থেকে দরজা সবই একটু পাৎলা, শব্দ আটকাবার মত শক্তি ধরে না।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভেতর থেকে একটা হুমকি গোছের শোনা গেল—না না এখন তোমায় যেতে দিচ্ছে কে?

গলাটা স্পষ্টই মনুভাইয়ের। নেশায় বেশ জড়িত।

তার উত্তরে লীনার কাতর আবেদনটাও শুনলাম,—দোহাই আপনার। এখন জোর করে আমায় ধরে রাখবেন না!

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলে এ নেপথ্য নাটিকার আরো কিছু সংলাপ বোধহয় শোনা যেত।

কিন্তু পরাশর সে লোভ জয় করে কলিং বেলটা জোরে জোরে টিপল। টিপল দুবার।

ওধার বেশ কয়েক সেকেণ্ড একেবারে নীরব। তারপরে দরজাটা এসে খুলে দিলেন স্বয়ং মনুভাই।

দরজা খুলে নেশায় আবিষ্ট চোখে আমাদের দিকে যেভাবে তাকালেন তাতে মনে হল আমাদের চিনতেই পারছেন না।

আমরা,—বলে পরাশর প্রায় পরিচয় দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ যেন স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে বললেন,—ও, আপনারা সেই টিকটিকি! তা আমার এখানে কেন? এখানে ত আরশুলা-টারশুলা নেই। কী? আছে লীনা?

মনুভাই নিজের রসিকতাতেই হেসে মাৎ করে পিছনে ফিরলেন লীনার জন্যে।

কিন্তু কোথায় সেখানে লীনা!

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভেতরে চলে গেছে নিশ্চয়।

লীনাকে দেখতে না পেয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে আমাদের দিকে ফিরে মনুভাই বললেন,—ভেলকি! স্রেফ ভেলকি! এই ছিল এই নেই!

মনুভাইয়ের অবস্থা এখন একটু বেশীরকম বেসামাল বলে বুঝলাম। পরাশরকে একটু টিপে দিয়ে সেই কথাই একটু ঘুরিয়ে জানালাম,—আজ হেড অফিসে ছুটি বুঝেছ? সাড়া দেবার কেউ নেই!

আছে! আছে!—মনুভাই হেসে উঠলেন,—ছুটি হলেও হেড অফিসের দারোয়ান যাবে কোথায়। টিকটিকিদের জন্যে সে খাড়া পাহারায় আছে। আসুন, আসুন পায়ের ধূলো দিয়ে কৃতার্থ করুন।

মনুভাই-এর অভিনয়ের ভাঁড়ামিতে যত না হতভম্ব হলাম তার চেয়ে বেশী হলাম তাঁর কথায়। মনুভাই গোড়া থেকে আমাদের সঙ্গে বাংলা কথাই বলছিলেন কিন্তু আমার ওই ঠারে কথাও বুঝে বাংলায় অমন চোস্ত জবাব তিনি দিতে পারবেন ভাবতে পারিনি।

আমি মনুভাই-এর ব্যঙ্গ অভ্যর্থনায় ভেতরে যেতে একটু দ্বিধা

www.boiRboi.blogspot.com

করছিলাম কিন্তু পরাশর যেন পরম আপ্যায়িত হয়ে গট গট করে ভেতরে চলে গেল।

তখন তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর উপায় কি?

বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকবার পরই ডাইনের একটি প্রশস্ত ড্রইংরুম। পরাশর মনুভাই-এর পথ দেখানোর জন্যে অপেক্ষা না করেই পর্দা সরিয়ে ড্রইংরুমের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

তার পেছনে পেছনে ঢোকবার সময়ই পরাশরের যেন বিস্মিত সম্ভাষণ শুনলাম।

এই যে লীনা দেবী! আপনার সঙ্গে আবার তাহলে দেখা হয়ে গেল। আপনি এখনো এখানে আছেন ভাবি নি।

লীনা দেবীর সম্বন্ধে একটু যেন বেশী ভাবছেন মনে হচ্ছে! পরাশরের কথার পিঠেই বিদ্রূপটা করে মনুভাই তখন ঘরের ভেতর এসে ঢুকেছেন।

নিজেই সবার আগে ধপ করে লীনার পাশে সেটী-টার ওপর বসে পড়ে আবার আমাদের ব্যঙ্গ আপ্যায়ন জানালেন জড়িত স্বরে,—

কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন! না, সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়েই এসেছেন! এখনই তল্লাসী শুরু করে দেবেন!

তল্লাসীতে ধরা পড়বার জন্যে আপনি এ ফ্ল্যাটে কিছু রেখে দিয়েছেন,—পরাশর মনুভাই-এর উপযুক্ত শ্লেষের সঙ্গেই জবাব দিলে,—এমন বোকা আপনাকে ভাবি না মনুভাই।

ভাবেন না? মনুভাই একটা হাত লীনার কাঁধের ওপর চড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আপনার এ তারিফে ধন্য হলাম। তাহলে এ ফ্ল্যাটে এসে অধমের প্রতি কৃপা করার কারণটা জানতে পারি। আমাদের লীনা দেবীকে আর একবার দেখবার জন্যে এসেছেন কি!

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনেই মনুভাই অভদ্রভাবে লীনাকে একটু কাছে টানবার চেষ্টা করলেন। লীনা

www.boiRboi.blogspot.com

অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে লজ্জিত কাতর মুখে তাঁর হাতের নাগালের বাইরে সরে গেল।

সে দৃশ্যটা দেখে আমার মুখটা তখন আপনা থেকে কঠিন হয়ে উঠেছে। মনুভাই-এর গালে একটি চপেটাঘাত করে একটু ভদ্রতার শিক্ষা দেবার জন্যে হাতটা নিশপিশ করছে তখন।

পরাশরকে কিন্তু নির্বিকারই মনে হল। সেটা যদি তার অভিনয় হয় তাহলে তার আত্মসংযমকে বাহাদুরী দিতে হয়।

কিছুই যেন লক্ষ্য করে নি এমনি ভাবে একটু হেসে মনুভাই-এর উপহাসটারই যেন জবাব দিতে পরাশর বললে,—লীনা দেবীর দেখা পাওয়াটা ত সৌভাগ্য। তবে, সেজন্য নয়, আপনার কাছে এসেছি শুধু একটা কথা জানবার জন্যে। যুগলভাই-এর ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসায় সেটা তখন জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পাই নি। অনুগ্রহ করে যদি প্রশ্নটার জবাব দেন তাহলে আর এক মুহূর্তও আপনাদের শান্তিভঙ্গ না করে চলে যাবো।

অত ভণিতার কি দরকার টিকটিকি সাহেব! মনুভাই ব্যঙ্গ আপ্যায়ন ছেড়ে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞাটা ভালো করেই এবার মুখে ফুটিয়ে বললেন,—কি প্রশ্ন আছে করে ফেলুন ঝটপট, তারপর সরে পড়ুন চটপট। নইলে টিকটিকি-গিরগিটি তাড়াবার ওষুধ আমি জানি।

আমার কান দুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রাগে কিন্তু পরাশর অপমানটা গ্রাহ্যই না করে শান্তভাবে বললে,—আপনি আজ আপনাদের দোকানে কেন গেছলেন এইটুকু শুধু জানতে চাই।

মনুভাই প্রথমটা যেন এ প্রশ্নে অবাকই হলেন।

বললেন,—বাঃ আমার দোকানে আমি গেছি তার আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি?

না, কৈফিয়ৎ নয় মনুভাইজি,—পরাশর আগের মতই শান্তস্বরে বললে,—কিন্তু আপনি ত দোকানে সাধারণত যান না। ন মাসে-ছ

www.boiRboi.blogspot.com

মাসেও আপনাকে দোকানে দেখা যায় না বলে শুনলাম। আজ হঠাৎ সেখানে গেলেন কেন সেইটকু তাই জানতে চাইছি। গেছলেন আবার ঠিক ঘটনার সময়টাতেই···

শ্যাট আপ! গেছলাম আমার খুশ। মনুভাই পরাশরকে হঠাৎ গর্জন করে উঠে থামিয়ে দিলেন,—আমার দোকানে আমি কখন যাই না যাই, দ্যাট্স নন্ অফ ইয়োর বিজনেস্। গেট আউট!

এ অপমানের পর গালে একটা থাপ্পড় যদি মারা না যায় তাহলে অন্তত আর একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়ানো অসম্ভব।

পরাশর কিন্তু অম্লানবদনে এ অপমান হজম করে প্রায় মিষ্টি গলাতেই বললে,—আপনি হঠাৎ রেগে গেলেন কেন মনুভাইজি! নিজের দোকানে সত্যিই ত আপনি যখন খুশি যেতে পারেন। তাই নিয়ে একটা নির্দোষ প্রশ্নে হঠাৎ অমন চটে উঠলে যে একটু অন্যরকম সন্দেহ হতে পারে! যেমন আমার মনে হচ্ছে যে···

গেট আউট! আই সে,—গেট আউট! মনুভাই এবার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন। পরাশরের অতগুলো কথা যে তিনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন সেইটেই আশ্চর্য।

মনুভাই-এর শেষ চিৎকারের সঙ্গে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল যা দেখে মনুভাই-এর মত আমরাও রীতিমত অবাক!

মনুভাই-এর শেষ 'গেট আউট' উচ্চারিত হতে না হতে দেখলাম লীনা হঠাৎ তার আসন ছেড়ে উঠে সবেগে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এই, এই···, তুমি ··বলে মনুভাই একবার টলমল পায়ে এগিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লীনা তখন তাঁর নাগালের বাইরে আর তিনি নিজে টাল সামালাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে সেটীর পিঠের ওপরে।

সেই অবস্থাতেই যেন কোন বাধাই পড়ে নি এমনিভাবেই পরাশর তার গর্জনে থামানো কথাটা শেষ করে মনুভাইকে শুনিয়ে দিলে

www.boiRboi.blogspot.com

অবিচলিতভাবে,—মনে হচ্ছে কেন বলি, দৃঢ় ধারণাই হচ্ছে যে মিস জাভেরী আপনার অচেনা নয়।

মুখ চোখ প্রায় ফেটে পড়বার মত লাল করে মনুভাই শুধু আর একবার চিৎকার করলেন,—গেট আউট!

এবার তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে পরাশর বেরিয়ে এল।

আবার লিফটে নিচে নামতে নামতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—হঠাৎ ওকথাটা বলতে গেলে কেন? মিস জাভেরীকে মনুভাই সত্যি জানে বলে মনে করো!

জানুক, না জানুক—পরাশর অদ্ভুতভাবে হেসে বললে,—বলে ত দিলাম।

এমনি বলে দিলে! সত্যি অবাক হয়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

না, এমনি ঠিক নয়,—পরাশর আগের মতই হেসে বললে,—ওই কথা বলে থামিয়ে লীনাকে পালাবার আর একটু সময় ত দেওয়া গেল!

লিফট তখন নিচে নেমে অটোমেটিক দরজা খুলে গেছে। কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওঠবার জন্যে।

পরাশরকে আর কিছু তাই আর জিজ্ঞাসা করা হল না। তার শেষ কৈফিয়তটা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না একেবারেই।

মনুভাই যুগলভাইদের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা করে ট্যাক্সি নিয়ে পরাশর ও আমি যে যার বাসায় চলে এসেছিলাম।

সারা দুপুর আর বিকেল অসহ্য ধকল আর হয়রানি গেছে।

বাসায় গিয়ে ভালো করে স্নান করে একটু নিজের কাগজের কাজ নিয়ে বসব ভেবেছিলাম।

তা আর হল না।

স্নান সেরে এসে কাগজের কাজ নিয়ে বসতে না বসতেই একটা ফোন এল।

ফোন করছেন মনুভাই যুগলভাই-এর দোকানের ঘোষাল। পরাশরকেই ফোন করেছিলেন। তাকে বাড়িতে না পেয়ে খবরটা অত্যন্ত জরুরী বলে আমাকেই জানাচ্ছেন। আমি যদি পরাশরের অন্য কোন জায়গায় থাকার কথা জানি তাহলে সম্ভব হলে সেখানেই ফোন করে যেন খবরটা দিই।

খবরটা যা শুনলাম, তা তুচ্ছ নয় বলেই মনে হল।

মনুভাই যুগলভাই-এর দোকানের সামনে যে ক্যাডিল্যাকটা দাঁড়িয়েছিল তার রহস্য জানা গিয়েছে।

গাড়িটা যার-তার নয়, মধ্যপ্রদেশের মাঝারি গোছের এক রাজ এস্টেটের। সেখানকার দেওয়ান কি কাজে তাঁদের স্টেটের গাড়ি নিয়ে কলকাতায় মাত্র কয়েক দিন হল এসেছেন। গাড়িটা কদিন ধরেই দুপুরে ওই রকম সময়ে দেওয়ানকে কোন অ্যাটর্নি অফিসে নামিয়ে কাছাকাছি এক জায়গায় পার্ক করে। সকালে পার্ক করতে যাবার সময়েই গাড়িটা একবার দোকানের সামনে বাধা পেয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থেমেছিল। ঘোষাল দুপুরে বেরিয়ে ওই এলাকারই একটি পার্কিং লটে একটা ক্যাডিল্যাক দেখে কৌতূহলী হন। রাজ এস্টেটের ইউনিফর্মপরা ড্রাইভারের সঙ্গে কৌশলে আলাপ জমিয়ে তারপর কথায় কথায় এসব খবর জেনেছেন।

পরাশরকে পেলেই এসব খবর দেব আশ্বাস দিয়ে ফোন ছাড়লাম।

বাড়িতে ফিরে এরই মধ্যে পরাশর কোথায় আবার গেল ভাবতে ভাবতেই ফোন বেজে উঠল আবার।

একবারে অচেনা মেয়ের গলা পেলাম ফোন তুলে।

প্রথমে আমার কাগজের কোন গ্রাহিকা বা লেখিকা হবেন

www.boiRboi.blogspot.com

ভেবেছিলাম। আমার নাম করে আছি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন। আমিই কথা বলছি জানিয়ে ফোন যিনি করছেন তাঁর নামটা জানতে চাইলাম।

জবাব যা পেলাম শুধু তাইতে নয়, বলার ধরনের একটি বিশেষত্বে একেবারে চমকে উঠতে হল।

একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ঈষৎ খসখসে ধরা গলায় ওধারের মেয়েটি বললে,—আমায় আপনি চেনেন না, তবে নামটা শুনলে একটু শিউরে উঠতে পারেন। আজ সারাদিন এ নামটা অনেকবার শুনেছেন। নামটা হল মিস জাভেরী। হ্যাঁ ফোনের ভেতরেই আপনার চমকে ওঠাটা টের পেলাম।

শুধু মিস জাভেরী নামটা শুনে চমকে আমি উঠি নি, চমকে উঠেছি ফোনের কথাতেও ঈষৎ তোৎলামির আভাস পেয়ে মেয়েটির পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে।

ওধারে মিস জাভেরী তখন বলে যাচ্ছে—আপনাকে ফোন করা থেকেই বুঝতে পারছেন যে, আপনারা আমাদের যেটুকু খোঁজ-খবর এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন তার চেয়ে আপনাদের নাড়ী-নক্ষত্র আমরা অনেক বেশী জানি। আপনারা আজ যা যা করেছেন সব কিছুর ওপর আমরা নজর রেখেছি। এ ফোনটা প্রথমে আপনাদের বড় গোয়েন্দাকেই করেছিলাম, তাঁকে বাসায় না পেয়ে আপনার ফোন খুঁজে বার করেছি। একটা বিশেষ কথা জানাবার জন্যে। এমন একটা কিছু আপনাদের জানাচ্ছি যা নিজেদের খুঁজে বার করতে আপনাদের একটা হপ্তা অন্ততঃ লেগে যেত। সেইরকম একটা খবর নিছক নিঃস্বার্থ বদান্যতায় আপনাদের জানাচ্ছি মনে করবেন না। এ চুরির রহস্যের কিনারা সারা জীবনেও আপনি বা আপনার বন্ধু পরাশর বর্মা করতে পারবেন না, আমি জানি। আসল চুরির না হোক তার গোটা কতক ফ্যাকড়ার মীমাংসা করে আপনাদেরও একটু বাহাদুরী নেবার সুযোগ দিতে আর

www.boiRboi.blogspot.com

সেই সঙ্গে দু-একজন নিরীহ নির্দোষ মানুষকে অযথা জ্বালাতনের হাত থেকে বাঁচাতে এই খবরটা দিচ্ছি বললে একেবারে মিথ্যে বলা হয় না। কিন্তু এর ওপরেও আরেকটা আসল উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হল, একটা সত্যিকার খেই ধরিয়ে দিলেও তার সুযোগ নিয়ে কতদূর পর্যন্ত আপনাদের গোয়েন্দাগিরি পৌঁছোয় তাই একটু পরীক্ষা করা। পুলিশ আর গোয়েন্দাদের যাচাই করা আমার একটা বিলাস বলেই এ সুযোগ দিচ্ছি।

মিস জাভেরী যখন শেষের লাইনটা বলছে তখন পরাশরকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হলাম। নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে নীরব থাকতে বলে ফোনটা ধরার জন্যে তাকে ইঙ্গিত করলাম। পরাশর মাথা নেড়ে তা ধরতে অস্বীকার করলে।

পরাশরকে ফোনটা দিয়ে হতভম্ব করা তাই আর হয়ে উঠল না। মিস জাভেরী তখন তার বক্তব্য শেষ করে এনেছে।

আমাদের পরীক্ষা করার স্পর্ধাটা জানাবার পর বলছে,—খেইটা এবার মন দিয়ে শুনুন। যে ঠিকানাটা দিচ্ছি আজ রাত্রেই নটা নাগাদ সেখানে একবার যাবেন আপনার বন্ধুকে নিয়ে। ঠিকানা শুনলেই বুঝবেন আজে-বাজে সন্দেহজনক জায়গায় আপনাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টায় নিয়ে যাবার টোপ ফেলছি না।

মিস জাভেরী তারপর দুবার করে ঠিকানাটা জানালে আর তারপরেই ঝট করে কেটে দিলে ফোনটা।

পরাশর এবার কাছে এসে বসবার পর উত্তেজিতভাবে ফোনের সমস্ত আলাপটা তাকে শোনালাম। সত্য সত্য শুনেছি বলে তাকে সবটা প্রায় নির্ভুলভাবেই পারলাম মুখস্থ বলতে।

মিস জাভেরী শেষ যে ঠিকানাটা দিয়েছে শুধু সেইটুকু জানাবার আগে একটু নাটকীয় না হয়ে অবশ্য পারলাম না।

বললাম,—কোথায় সে যেতে বলেছে ভাবতে পারো?

পরাশরকে যেন একটু অসহায় ও ভাবিতই মনে হল।

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিকানাটা তাকে বলতে যাচ্ছি এমন সময় বেশ একটু ভেবে-কুল-না-পাওয়া মুখ করেই সে যেন আন্দাজ করে বললে,—সার্কাস অ্যাভিনিউর ওই নতুন হোটেলটা কি?

নাম ঠিকানা সে একেবারে নির্ভুল বলে দিলে এবার।

শুধু আন্দাজে এরকম বলা কি সম্ভব? আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে তাকালাম।

সে এবার হেসে ফেলে বললে,—না হে, ভয় পেয়ো না। অলৌকিক সিদ্ধাই-টিদ্ধাই কিছু হয় নি আমার। যা বললাম তা অনেক খেটে-খুটে বার করতে হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে তুমি বাসায় ফিরেছ, তার আমি এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুরেই বেড়িয়েছি।

আমার হয়রানির কিছুটা শোধ তাতে হল।—বলে ঠাট্টা করে আগের ঘোষালের ফোনটার কথাও তাকে জানালাম।

মধ্যপ্রদেশের একটা রাজ এস্টেটের গাড়ি! একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সে হেসে বললে,—এটাও তাহলে মিলল!

কি মিলল?—তাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে তখন ফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করতে শুরু করেছে।

ফোন রিং করবার পর ওধারের সাড়া পেয়ে পরাশর যা বললে তাতেই ফোনটা কোথায় করেছে বুঝতে পারলাম।

হ্যাঁ, একটা টেবিল আটটা থেকে রিজার্ভ রাখবেন। হ্যাঁ ছোট টেবিল দু'জনের মাত্র—পরাশর বেশ ভারিক্কী চালে তার একটা পেটেন্ট নকল বিদেশী গলায় অর্ডার দিলে,—সীট দুটো যেন ফ্লোর শো-র কাছে হয়।

ওধার থেকে কি যেন প্রশ্ন হল। তার উত্তরে পরাশর একটু যেন অধৈর্য দেখিয়ে জানালে, বুক করবেন দেওয়ানজির নামে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিঙ্গওয়াই-রাজ? আর কোন এস্টেটের দেওয়ানজি আপনাদের ওখানে এখন যান? জানি জানি, একটা টেবিল আগেই রিজার্ভ করা আছে। আর একটা চাই বলেই ফোন

www.boiRboi.blogspot.com

করা হচ্ছে এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি যার নেই তাকে একাজ দেওয়া হয় কেন? বেশ, বেশ, আপনাদের নিয়ম ভাঙতে হবে না। এটা বুক করুন মনুভাইএর নামে। হ্যাঁ মনুভাই চোখানি।

পরাশর ফোনটা নামিয়ে রাখার পর হতভম্ব হয়ে তার দিকে চেয়ে বললাম,—এটা কি করলে? ডিঙ্গওয়াই রাজের দেওয়ানকে তুমি চেনো?

নামটা শুনেছি!—পরাশর অন্যায় করে ধরা পড়া ছেলেমানুষের মত একটু হাসল।

আর তারই জোরে তার নামে টেবিল বুক করলে ওই অখদ্দে রেস্তোরাঁয়!—আমি হতবুদ্ধি হয়ে বললাম।

তার নামে নয়, করলাম ত মনুভাই-এর নামে!—পরাশর এমনভাবে বললে যেন চমৎকার একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে বার করেছে।

তা ত দেখলাম!—আমি ধৈর্য হারিয়ে তিক্তস্বরে বললাম, কিন্তু করার মানেটা কি?

বাঃ—পরাশর এবার যেন আমারই বোকামিতে অবাক হয়ে বললে, টেবিল বুক করার মানে যা তাই আমরা ও টেবিলে গিয়ে বসছি আজ আটটা থেকে!

হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আর কিছু বলতেই পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত যেতে হল পরাশরের সঙ্গে।

বসে বসে দেখতেও হল নাচের সেই জঘন্য নগ্নতাবিলাস, একটার পর একটা।

যতটুকু আবরণ না থাকলে এখনো এদেশের আইনে বাধে সেইটুকু মাত্র রেখে নাচবার ছলে মোটা রঙের প্রলেপে বার্নিশ করা দুটো মেয়ে আর পুরুষ বিকট অঙ্গভঙ্গী করে গেল।

চোখ বুজে থাকলেও শান্তি নেই। নাচ না দেখো বাজনা শুনতে হবে। আর সে বাজনা সদ্য সদ্য পাগলা গারদ থেকে আমদানি করা।

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক আটটার সময়ে নিজেদের টেবিলে এসে বসেছিলাম। পরাশরের জেদাজেদিতে গলাবন্ধ কোট সমেত জাতীয় পোষাক পরে যেতে হয়েছিল।

এসব রেস্তোরাঁর পানীয়তেও ভেজাল। তাই নিরাপদে থাকবার জন্যে একটা বীয়ার আর লেমনেডে শ্যাণ্ডি করে গেলাসে ঢেলে সামনে ধরে রেখেছিলাম দেখাবার জন্যে।

একে একে কাছাকাছি অন্য সব টেবিল ভর্তি হয়ে এল সাড়ে আটটার মধ্যেই। একটি টেবিলই শুধু খালি রইল। আমাদের চেয়ে একটু বড় টেবিল, চেয়ার লাগানো সেখানে তিনটি।

কারা এ টেবিলে আসছে মনে মনে তা নিয়ে একটু জল্পনা না করে পারিনি।

নাম ত শুনেছি পরাশরের ফোন থেকে। ডিঙ্গওয়াই রাজের দেওয়ানজি'র।

ডিঙ্গওয়াই রাজের দেওয়ানজি'র রিজার্ভ-করা টেবিলের পাশে বসবার এত গরজ পরাশরের কেন?

ফোনে মিস জাভেরীও এই হোটেলে আসতে বলেছিল। যে জন্যে বলেছিল এই দেওয়ানজি কি তার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত?

মিস জাভেরী সে রকম কিছু স্পষ্ট করে বলে নি। সে শুধু বলেছিল রাত নটার সময় আসতে।

দেওয়ানজিদের টেবিল এখনো খালি দেখে মনে হয় যদি কিছু এখানে হবার হয়ত রাত নটার আগে হবে না। মিস জাভেরী কিছু না বললেও দেওয়ানজির সঙ্গে সে ব্যাপারের কিছু সংশ্রব নিশ্চয়ই আছে।

পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। সে এমন তন্ময় হয়ে ফ্লোর শো দেখছে যে আমারই লজ্জা করছে তার পাশে বসে থাকতে।

www.boiRboi.blogspot.com

এই ত নাচের ছিরি! মেয়েগুলোর চেহারা-চটক যদি একটু থাকত তাহলেও সাতখুন মাফ হত। কিন্তু ওই চেহারার মেয়েদের ওই নাচ যদি হাঁ করে কেউ যেন গিলছে মনে হয় তার পাশ থেকে ছুটে পালাবার ইচ্ছে হয় কি না।

সে ইচ্ছে কোনরকমে দমন করে বসে ছিলাম শুধু একটি কারণে।

অস্বীকার করে লাভ নেই যে তিনটে চেয়ার লাগানো খালি টেবিলটা আমায় তীব্র কোতূহলের টানে জোর করে ধরে রেখেছিল।

দেওয়ানজি ত বুঝলাম, তাঁর সঙ্গে আর কারা এমন আসছে যাদের রহস্যের ইঙ্গিত মিস জাভেরীর ফোনে যেমন পেয়েছি তেমনি তার সমর্থন পরাশর টেবিল বুক করায়?

বেশীক্ষণ আর উৎকণ্ঠিত থাকতে হল না।

ঠিক নটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় ঘণ্টা বাজল। আওয়াজটা বেশ মধুরই বলা চলে। তারপরেই নারীকণ্ঠে একটা ঘোষণা।—এবার আমরা প্লুটোর রাজ্য হেড্‌স্‌-এ নেমে যাবো। যাঁরা এখানে উপস্থিত তাঁরা ভয় পাবেন না। হেড্‌স্‌ আলো-আঁধারীর রাজ্য বটে কিন্তু পুরাণের সে হেড্‌স্‌ এখন একেবারে বদলে গেছে। বিষাদের বদলে তা এখন কি রকম স্ফূর্তির রাজ্য স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন। যে যার আসন নিন। আর কয়েক মিনিট বাদেই সব আলো ম্লান হয়ে যাবে।

মিনিট তিনেক বাদে, হতে শুরু করলও তাই।

দেওয়ানজির পার্টি আর যখন আসবে না বলে-ই ধরে নিয়েছি, ঠিক তখনই সমস্ত আলো প্রায় নিভে গিয়ে একটা আবছা অন্ধকারে নাচের হল আচ্ছন্ন হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে একজন হোটেল বয়কে সসম্ভ্রমে একটি দলকে সেই খালি টেবিলে এনে বসাতে দেখলাম।

ওই আবছা অন্ধকারেও একজন বাদে দলের আর দুজনকে চিনতে পেরে সত্যি তখন বিস্ময় বিহ্বল হয়ে গেছি।

www.boiRboi.blogspot.com

সত্যি কথা বলতে গেলে এদের দুজনকে একসঙ্গে এ রেস্তোরাঁর নাচের আসরে দেখব ভাবতে পারিনি।

চিনতে যাঁকে পারিনি, তিনি কে সে অনুমান অবশ্য ঠিকই করেছি। তিনিই যে ডিঙ্গওয়াই রাজের দেওয়ানজি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে মনুভাই আর লীনা এল কোথা থেকে!

এ রকম অদ্ভুত যোগাযোগ ত কল্পনা করাই শক্ত।

মিস জাভেরীর দেওয়া ইঙ্গিত তাহলে মিথ্যে নয়, পরাশরের আগে থাকতে জায়গা নিয়ে বসার ব্যবস্থাও।

কিন্তু মনুভাই আর লীনার এই রেস্তোরাঁয় উপস্থিতি থেকে রহস্য-ভেদের কি খেই পাওয়া যাচ্ছে?

যতটুকু ইতিমধ্যে জেনেছি আমি ত তার বেশী কোন হদিসই পেলাম না।

অপেক্ষা করে রইলাম পরাশর কি বলে আর করে তার জন্যে।

কিন্তু অপেক্ষা করা বোধ হয় বৃথাই হবে আজ। পরাশরের এরকম অবস্থা এতদিনের সংসর্গে কোনদিন দেখিনি। ড্রিংক সে একটু-আধটু কখনো করে না এমন নয়, কিন্তু নিজের ওপর রাশ টানবার ক্ষমতা তার অত্যন্ত বেশী। কোনো দিন মাত্রা ছাড়িয়ে এতটুকু বেসামাল হতে আমি ত অন্ততঃ দেখিনি।

কিন্তু আজ এ কি তার হল!

দেওয়ানজির সঙ্গে যাদের আসন নিতে দেখে আমি অতখানি বিচলিত হয়ে উঠেছি পরাশর তাদের লক্ষ্য করেছে কি না তাই সন্দেহ হচ্ছে। চেয়ারে সোজা হয়ে বসতেও যেন সে পারছে না। এখনও মাত্রাজ্ঞানটা অত্যন্ত প্রখর বলে কোনো রকমে চেয়ারের হাতল জোর করে ধরে সে সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে আছে, কিন্তু তার ধরন দেখে মনে হচ্ছে টেবিলের ওপর একটু অসাবধান হলেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে।

এসব রেস্তোরাঁর পানীয় বিশ্বাস করবার মত নয় বলে তাকে

www.boiRboi.blogspot.com

আগেই আমি সাবধান করে অবশ্য দিয়েছিলাম। নিজে সেই জন্যে 'শ্যাণ্ডি' ছাড়া আর কিছু মুখে তুলছি না। কিন্তু আমার বারণ বা দৃষ্টান্ত কোন কিছুই সে গ্রাহ্য করে নি। 'ফ্লোর শো' দেখেই কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে গিয়ে একখনকার আজেবাজে ছাইপাঁশ সব নির্বিকার ভাবে চালিয়ে গেছে।

এখন ত রহস্য-ভেদের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে সামলানই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে।

হেড্‌স্‌-এর উৎসব মানে নরক গুলজারের বেলেল্লাগিরি যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ সে তবু আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নাচের দিকে চেয়ে নিস্পন্দের মত বসেছিল। নাচটা থেমে গেলে ধীরে ধীরে আলোগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পর আর তাকে রোখা গেল না।

হঠাৎ একটা উল্লসিত চিৎকার ছেড়ে টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে হাততালি শুরু করে দিলে।

হাততালি আরো অনেকেই তখন দিচ্ছে। কিন্তু তারা সবাই থেমে যাওয়ার পরেও পরাশরের হাততালি আর থামে না।

শুধু হাততালি দিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়, মনে হল নাচিয়ের দল যেদিকে চলে গেছে সেও সেদিকে গিয়ে তাদের আরো অভিনন্দন জানাতে চায়।

নাচের জন্য আলাদা করে ঘিরে রাখা প্ল্যাটফর্মের ওপরই তখন সে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় রাগে বিরক্তিতে প্রায় ধৈর্য হারিয়ে তাকে ধরে ফেলে সজোরে নাড়া দিয়ে চাপাগলায় বললাম, —কি হচ্ছে কি পরাশর? লজ্জা করে না তোমার?

আমার নাড়া খেয়ে পরাশরের একটু হুঁশ যেন ফিরে এল।

যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে বিহ্বলভাবে এদিক ওদিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে কি?

তখন রেস্তোরাঁর অনেক টেবিলের দৃষ্টি আমাদের টেবিলের দিকে পড়েছে। লজ্জায় আমার মনে হচ্ছে ধরণী দ্বিধা হোক।

www.boiRboi.blogspot.com

তবু দুঃখ ক্ষোভ সব যথাসাধ্য গোপন করে শুধু একটু কঠিন স্বরে বললাম, তুমি অসুস্থ হয়েছ।

হ্যাঁ, আমার শরীরটা কি রকম খারাপ লাগছে। বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে পরাশর প্রায় কাতরভাবে বললে, আমায় বাসায় নিয়ে চলো কৃত্তিবাস।

মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বললাম, তাই যাচ্ছি, চলো। শুধু বিলটা চুকিয়ে দিই।

হোটেল বয় অবস্থা বুঝে কাছেই ঘুর-ঘুর করছিলো। একবার মুখ তুলে তাকাতেই বিল এনে দিলে।

বিলটা মিটিয়ে পরাশরকে ধরে তুলে বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি এমন সময়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর শুনে বাধ্য হয়ে থামতে হল।

আরে, এ আমাদের সেই দুই টিকটিকি গিরগিটি সাহেব না? এঁরা দুজন এখানে! পৃথিবীটা বড্ড ছোট মনে হচ্ছে। শুধু ছোট নয় দুলছেও যেন বড় বেশী, তাই না?

হুলের মত জ্বালাধরানো কথাগুলো যে মনুভাই-এর তা আর বোধ হয় বলার দরকার নেই।

'ফ্লোর শো' শেষ হলে আলো জ্বলে ওঠার পর ইচ্ছে করে ওদের দিকে তাকাই নি। পরাশরের এই অবস্থা তাদের চোখে পড়বার আগে কোনরকমে যদি বেরিয়ে যেতে পারি সেই চেষ্টাতেই ছিলাম।

কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হল। এখন আর তাদের না দেখার ভান করে চলে যাওয়া যায় না। তাছাড়া পরাশরের জন্যেই তা আর তখন সম্ভব নয়।

মনুভাই-এর গলা শুনেই সে একেবারে মরুভূমিতে ওয়েসিস পাবার মত খুশিতে যেন ডগমগ হয়ে তাদের টেবিলের ওপর দুহাতে ভর দিয়ে বললে, আরে এই ত আমাদের ওল্ড ফ্রেণ্ড মনুভাই, আর এইত সেই লীনা দেবী যিনি স্রেফ ভেল্‌কী! এই নেই এই

www.boiRboi.blogspot.com

আছে! কখন পালাচ্ছেন, কখন ধরা দিচ্ছেন কিছু বোঝবার উপায় নেই।

পরাশর নেশার ঘোরেই মাথাটা ঝুলে পড়ায় একটু থামল।

চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে টেবিলের তিনজনের তিন বিচিত্র মুখের ভাব দেখলাম।

লীনার মুখটা বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখে তার একটা কিসের যেন আতঙ্কেরই ছায়া। মনুভাই-এর মুখে একটা নির্মম কৌতুক ফুটে উঠেছে। পরাশরের দুর্দশাটা বেশ ভালো ভাবেই উপভোগ করছেন। আর দেওয়ানজির মুখে চোখে একটা তীব্র উন্নাসিক ঘৃণা আর অধৈর্যের ছাপ।

পরাশর কয়েক সেকেণ্ডের পরই আবার একটু হুঁশ ফিরে পেয়ে বন্ধুত্বের দাবীতেই যেন বললে, আমি এখানে একটু বসতে পারি।

না। হিংস্র অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন এবার স্বয়ং দেওয়ানজি।

পরাশরের স্পর্ধার উপযুক্ত জবাব দিয়ে মনুভাই-এর দিকে ফিরে তিনি বেশ বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই ইতর লোফারটা? আপনার বন্ধু?

আমার বন্ধু? মনুভাই ঘৃণাভরে হেসে উঠলেন, এই একটা টিকটিকি আর গিরগিটি। এই স্কাউণ্ড্রেল দুটো!

এই স্কাউণ্ড্রেল দুটো!—পরাশরের এ গালাগালে খুশি যেন আর ধরে না। নিজেই দুবার যেন উপাধির মত আউড়ে গদগদ হয়ে বললে, ঠিক বলেছেন মনুভাই, আমাদের একেবারে রাজযোটক হয়েছে এখানে। আমরা দুজনে স্কাউণ্ড্রেল আপনি একজন ব্ল্যাক-মেলার আর এই দেওয়ানজি একজন এমবেজ্‌লার!

মনুভাই আর দেওয়ানজির তখন শুধু রাগে ফেটে পড়তে বাকি! মাতালের মাতলামি হিসেবেও যে পরাশরের কথাগুলো সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সে কথা আমিও তখন আর অস্বীকার করতে পারি না।

www.boiRboi.blogspot.com

মনুভাই দাঁড়িয়ে উঠে একজন বেয়ারাকে তখন ম্যানেজারকে ডাকতে বলছেন আর দেওয়ানজি রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইংরেজিতে বলছেন, কি ধরনের হোটেল এটা! এই রাসকেলটাকে লাথিয়ে বার করে দেয় এমন কেউ কি এখানে নেই!

পরাশর কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ না করে তার নিজের কথাই নির্বিকারভাবে বলে যাচ্ছে,—কেন মিছিমিছি গোলমাল বাধাচ্ছেন মনুভাই। আপনি ব্ল্যাকমেলার কিনা নিজেই জানেন। ব্ল্যাকমেল করেই না লীনা দেবীকে এখানে এনেছেন। এছাড়া নিজেদের কার-বারের হাজার দশেক টাকার একটা হিসেবের গোলমালও বোধহয় আপনার মেটাবার আছে।

স্তম্ভিত হয়েই মনুভাই-এর মুখ দিয়ে আর বোধহয় কথা সরে নি।

দেওয়ানজির রাগ তখন সপ্তমে চড়েছে, তিনি পুলিশ ডাকতে বলছেন খোদ ম্যানেজারের আগে তাঁর যে সহকারী সেখানে এসে পৌঁছেছে তাকে।

সহকারী তাই ডাকতেই যাচ্ছিল হয়ত। কিন্তু পরাশর তাকে ডেকে থামালে—দাঁড়ান দাঁড়ান। পুলিশ ডাকবার জন্যে অত ব্যস্ত হবেন না। পুলিশ এখানেই আছে। আমি আগে থাকতে ডাকিয়ে রেখেছি। ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে বাইরে যাবার দরজার দিকের একটা টেবিল লক্ষ করলেই তাঁদের দেখতে পাবেন। একজন এস আই তাঁর পুলিশের পোশাকেই আর একজন সাদা পোশাকে।

আপনা থেকেই সকলের মাথাটা সেদিকে এবার ঘুরে গেছে। সত্যিই সেখানে পুলিশের লোক বসে আছে।

শুধু তাই দেখে নয় আমি অবাক হয়েছি আরো বেশী পরাশরের গলা শুনে। কোথায় সেই মাতালের জড়ানো গলা আর এলিয়ে যাওয়া শরীর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কঠিন গলায় সে তখন বলছে, পুলিশ ডাকলেই আসবে কিন্তু তারা এলে আমার কথাটা ত না জানিয়ে পারব না। ডিঙ্গওয়াই-রাজের দেওয়ানজি যে এস্টেটের

www.boiRboi.blogspot.com

গচ্ছিত টাকা নিয়ে তেজারতীর ব্যবসা করেন এ অভিযোগটা আমায় তখন জানাতেই হবে। আজকাল সেণ্টাল-এর মেজাজ বড় কড়া। এসব কীর্তি করে অনায়াসে শুধু চাঁদির জুতোয় পার পেয়ে যাবার দিন আর নেই। সুতরাং পুলিশ ডাকার বদলে আমি যা বলছি তাই করাই ভালো কিনা ভেবে দেখুন। আমার আবদার খুব বেশী কিছু নয়। এখান থেকে সকলে মিলে একবার যুগলভাই-এর কাছে যাওয়া। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। এখানে আসবার আগে আজ রাত্রের মধ্যে হয়ত সব রহস্য ভেদ করতে পারি বলে তাঁকে আশা দিয়ে তৈরী থাকতে বলেছি।

পরাশর এই পর্যন্ত বলার পরই যা ঘটল তার জন্যেই কেউই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

আর কেউ নয় স্বয়ং লীনাই হঠাৎ সীট থেকে ছুটে গেল বাইরের দরজার দিকে।

হতভম্ব হয়ে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই সে প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। বেচারার পালানো আর হল না। পুলিশের লোক মিছেই সেখানে বসে নেই। তারাই তার পথ আটকালে।

সকলেই এই নাটকীয় ব্যাপারটা তখন দেখছিলাম।

লীনার বিফলতায় বেশ একটু যেন হতাশার নিশ্বাস ফেলে মনুভাই ও দেওয়ানজির দিকে ফিরে পরাশর বললে—আশা করি আমার প্রস্তাবে আর আপনাদের আপত্তি নেই। আর দেরী না করে চলুন তাহলে।

আশ্চর্যের কথা খানিক আগে যাঁদের সেই রুদ্রমূর্তি দেখেছি তাঁরা পরাশরের কথায় এখন সুবোধ সুশীল বালকের মত আমাদের সঙ্গে চললেন।

যাবার পথে মাঝখানে ছোট ম্যানেজারের টেবিলের পাশ

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে পরাশর বললে, দাঁড়ান যাবার আগে একটু ফোন করে যাওয়াই ভালো।

ফোন কনেকশন পেয়ে সে যা বললে তাতে কিন্তু সবাই আমরা তাজ্জব।

ফোনের একদিকের কথাগুলোই শুনেছি। তবু সেই এক-তরফা আলাপটাই সামনে ধরে দিলে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝবার বোধহয় বিশেষ অসুবিধে হবে না।

পরাশরের কথাগুলো ধারাবাহিকভাবে এই·····

হ্যাঁ, আমি পরাশর বর্মা বলছি সার্কাস অ্যাভেনিউর মোড়ের নতুন হোটেল আর রেস্তোরাঁ শাহজাদী থেকে।

হ্যাঁ, সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে। আপনি আবার শেষমুহূর্তে সেবারকার মত ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইবেন না ত? না, বলছেন? এবারে অপরাধীকে ধরা চাই-ই! তাই হবে।

আমি ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আপনার ফ্ল্যাটেই যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাচ্ছেন ডিঙ্গওয়াইরাজের-দেওয়ানজি, আপনার দাদা মনুভাই, লীনা দেবী আর আমার বন্ধু মিঃ ভদ্র। হ্যাঁ, আর একজন পুলিশ অফিসার আর কয়েকজন কনেস্টবলও যাচ্ছে। সাবধানের বিনাশ নেই।

না, আমরা দেওয়ানজির ক্যাডিল্যাকেই যাচ্ছি। ওতেই আমাদের সকলের কুলিয়ে যাবে। আর পুলিশ নিজেদের ভ্যানে যাচ্ছে।

লীনা এখানে কেমন করে এল? ব্ল্যাকমেল করে ওকে আনা হয়েছে।

আনবে আর কে! মনুভাই। উনি মিস জাভেরীকে চেনেন। আমার আগেই উনি আঁচ করেছিলেন আর তারই জোরে ব্ল্যাকমেল করেছিলেন লীনা দেবীকে।

দেওয়ানজি এর ভেতরে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? তা আপনি

জিজ্ঞাসা করতে পারেন বটে। মন্নুভাই এতদিন যা হুণ্ডি কেটেছেন সব ত দেওয়ানজির কাছে। দেওয়ানজি তাঁদের স্টেটের জমানো টাকা নিয়ে বেশ ভালো কারবার চালাচ্ছিলেন। বোম্বাই-দিল্লী-কলকাতা সব জায়গায় ওঁর জাল ছড়ানো। মন্নুভাই-এর মত আহাম্মকদের উনি সবসময়ে ধার দিতে মুক্তহস্ত। মন্নুভাই দেনায় একেবারে ডুবে আছেন। ওরকম একটা চুরিচামারি গোছের কিছু করা ওঁর তাই একান্ত দরকার ছিল।

—হ্যাঁ তার জন্যে মিস জাভেরীর মত একটি অ্যাসিসট্যাণ্টও দরকার। সে শুধু যোগ্য হলেই হবে না তাকে আবার রাজী করানো চাই। তা আপনাদের আশ্রিতা হিসাবে একটা মাসোহারার ওপর যার ভরসা তার রাজী না হয়ে উপায় কি!

—হ্যাঁ খুব শক্তও কিছু নয়। মাথায় সোনালী চুলের ঢিবি খোঁপাটাই সন্দেহ জাগাবার মত। সোনালী পরচুলের ঘটি-খোঁপার তলায় নিজস্ব চুল অনায়াসে লুকানো যায়। ভালো করে পেণ্ট করে নিজের স্বাভাবিক রংটা ঢাকাও মোটেই শক্ত নয়। তারপর পোশাক আশাক একেবারে বদলে গলাটা একটু ধরা যাকে বলে 'হাস্‌কি' আর একটু তোৎলামি। ও তোৎলামি করেও কি হুঁশিয়ার লোককে ফাঁকি দেওয়া যায়। তবে লীনা দেবী বুদ্ধিমান মেয়ে বলতেই হবে। আমার বন্ধু মিঃ ভদ্রকে দিয়ে পরীক্ষার সময় দ্বিতীয়বার মিস্ জাভেরীর ভূমিকায় নেমে এমন একটা আনাড়িপনা দেখিয়েছেন যাতে মিস জাভেরীকে অনেক বেশী চালাক কেউ বলে মনে হয়। উনি ইচ্ছে করে আমার বন্ধুকে জিতিয়ে দেবারই চেষ্টা করেছেন। ওঁকে আমার বন্ধু ত হারিয়েই ফেলেছিল। উনি মার্কেটের দিক থেকে আবার সুরেন ব্যানার্জি রোডে না ফিরলে ওইখানেই আমার বন্ধুর পিছু নেওয়া শেষ হয়ে যেত।

—দেওয়ানজির ক্যাডিল্যাকটা খুব বুদ্ধি করে কাজে লাগান

www.boiRboi.blogspot.com

হয়েছে। না, দেওয়ানজি এ চুরির মধ্যে নেই। তিনি গলাকাটা সুদ পেয়েই খুশি। তাই আদায় করতেই মাঝে মাঝে কলকাতায় তাঁকে নিজেকে আসতে হয়। এবারে এসেছিলেন মনুভাই-এর কারবারের অর্ধেক অংশটাই দেনার দায়ে কিনে নেবার লোভে অ্যাটর্নিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। তাঁর গাড়িটা ওই পাড়াতেই থাকে, যায় দোকানের সামনে দিয়ে। মিস জাভেরী সেজে লীনা দেবী হঠাৎ যেন গাড়ির সামনে পড়ে সেটা থামিয়ে তারপর তার সামনে দিয়ে দোকানে গিয়ে ঢুকেছেন। সঙ্গে একজন উর্দিপরা বেয়ারা নিয়ে।

—আমি কি করে ধরলাম? লীনা দেবীকে একটি যে প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর পেয়েই। মনে আছে বোধহয় লীনা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—গাড়িটার সামনে মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কিনা, তাতে লীনা দেবী উত্তর দিয়েছিলন যে থমকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল বোধহয়। ওই উত্তরই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাঁর হঠাৎ ওই সময়ে সামনের বই-এর দোকানে বই কিনতে আসা ইত্যাদি সবই যদি সত্য বলে মানি তবু এই একটি ব্যাপারে তাঁর ওপর থেকে বিশ্বাস চলে যায়। ভালো একটা গাড়িই যদি তাঁর আকর্ষণ হয় তাহলে সেটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখার সময় তার সামনে কে কি করছে তা খুঁটিয়ে লক্ষ করা অসম্ভব। লীনা দেবী ধরা পড়েছেন আর একটি কারণে। ভেতরের অফিস ঘর থেকে তাঁকে কেউ লুকিয়ে সাহায্য না করলে কিছুতেই তাঁর বাক্সে ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মেকির বদলে আসল অলঙ্কার আর দামী পাথরের ট্রে বদল করতে তিনি পারতেন না। মিস জাভেরী বলে সত্যি কোনো অচেনা মেয়ে হলে তাকে আপনাদের দু ভাই-এর কেউ আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতেন না।

—হ্যাঁ সেই পাথরটা হাত ফস্কে পড়ে যাবার ভান করে যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছে তখনই ট্রেটা বদল হয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—কে বদল করেছে এখনো জিজ্ঞাসা করছেন? আপনি ছাড়া আর কে করবে! আকাশ থেকে পড়বার ভান করবেন না, কোনরকম পালাবার চেষ্টাও। পুলিশ আপনার ফ্ল্যাটের বাইরেও মোতায়েন আছে। এ চুরির ব্যবস্থা ত আপনার একটা সামান্য কীর্তি মাত্র। আপনার বাবার মৃত্যুর পর চোরাই সোনাদানা হীরেজহরৎ-এর কারবার করে কদিনে ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। বড়ভাই আপনার উড়নচড়ে স্ফূর্তিবাজ একটু গোঁয়ার। কিন্তু আসলে মনুভাই বোকা ভালমানুষ। লীনা দেবীকে তিনি সত্যি ভালবাসেন। লীনা দেবীকেই তিনি বিয়ে করতে পারতেন, কিন্তু আপনি তাতে যতভাবে সম্ভব গোপনে বাদ সাধছেন। আশ্রিতা বলে লীনা দেবীর ওপর মনুভাই জুলুম করে এই ধারণাই আপনি করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সত্যিকার অমানুষিক জুলুম করেন আপনি। আর সামান্য ওই মাসোহারা কাটবার ভয় দেখিয়ে নয়। লীনা দেবী ওই মাসোহারাটুকুর জন্যে লালায়িত নয়। তার ওপর জুলুমের চেয়ে যা বেশী সেই ব্ল্যাকমেল আপনিই করে আসছেন। কবে আসছেন মনুভাই-এর সেই আগেকার দশ হাজার টাকা কোম্পানীর তহবিল থেকে চুরির কথা ফাঁস করে দিয়ে তাঁকে কাঠগড়ায় তোলবার ভয় দেখিয়ে। লীনা দেবীর মনুভাই সম্বন্ধে মনোভাব যে কি তা আপনি ভালো করেই জানেন। তারই সুযোগ নিয়ে আপনি শেষপর্যন্ত তাকে মিস জাভেরী সেজে এই চুরিতে অংশ নিতেও বাধ্য করেছেন। যেমন করেই হোক লীনা দেবীই যে মিস জাভেরী সেজেছেন মনুভাই সেই দোকানে চুরির সময়েই সন্দেহ করেন। এর ভেতর আপনার হাত আছে কল্পনা না করে তিনি লীনা দেবীর এ অধঃপতনে হতভম্ব হলেও তাঁকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেন। লীনা দেবীকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে মনুভাই, তাঁকে এই ব্যাপার নিয়েই চেপে ধরেন। মনুভাই-এর খাতিরেই কোনো কথা স্বীকার

www.boiRboi.blogspot.com

করতে না পেরে লীনা দেবী সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যান সে ফ্ল্যাট থেকে। মনে কিন্তু তিনি শান্তি পান না। তিনি নিজে কিছু না বললেও গোয়েন্দা হিসেবে আমি যাতে রহস্যটা ভেদ করতে পারি সেইজন্যেই নিজে থেকে 'শাহজাদী'র খবর দেবার জন্যে মিস্ জাভেরী সেজে তিনি ফোন করেন। মনুভাই ব্ল্যাকমেল করে লীনা দেবীকে 'শাহজাদী'-তে নিয়ে যান নি। তিনি যে দেওয়ানজির কাছে আকণ্ঠ দেনায় ডুবে আছেন সে কথা লীনা দেবীর কাছে সরলভাবে স্বীকার করার পর লীনা দেবীই এ রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে দেওয়ানজিকে দেখবার জন্যে যেতে চেয়েছিলেন। লীনা দেবীর উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য আলাদা। দেওয়ানজির সঙ্গে মনুভাই আর লীনা দেবীকে দেখে আমি আসল ব্যাপারটার একটু হদিস পেতে পারি এই আশা তিনি করেছিলেন। 'চুরির রহস্যটার কিনারা হলে আপনার সঙ্গে তাঁকেও অভিযুক্ত হতে হবে তা জেনেও লীনা দেবী শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

—শাস্তি অবশ্য তাঁর এতটুকু প্রাপ্য নয়। আপনিই ব্ল্যাকমেল করে তাঁকে দিয়ে যা করাবার করেছেন। লুটের মালের একটা কানাকড়িও লীনা দেবী নেন নি। সব আপনি হাতিয়েছেন।

—আপনার ওখানে যেতে বারণ করছেন? বেশ যাব না। কিন্তু সব তাহলে স্বীকার করছেন! করেও হাসছেন? বলছেন, এ সব কিছুই আমি প্রমাণ করতে পারব না? প্রমাণ রাখবার মত কাঁচা কাজ আপনি করেন নি!

—একটু যে এখনই করে ফেললেন যুগলভাইজী। আমাদের এই সমস্ত আলাপটাই যে অন্য রিসিভারে টেপ-রেকর্ড হয়ে গেল। টেপ-রেকর্ড করছেন লালবাজারের একজন বড় অফিসার স্বয়ং। গুড নাইট আর আপনাকে জ্বালাবো না। অনেক রাতের মত সব শান্তি আপনার আজ থেকে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

কোথায় মানুষ জনে যানবাহনে গিজ্‌গিজ করা কলকাতায় শহর আর কোথায় ভারতের পূব পশ্চিমের ধু-ধু বালির নির্জন দুই তীরভূমি।

বাইরের দিক দিয়ে কোন মিলই নেই। এই দুই বিপরীত পরিবেশে পরাশরের সঙ্গে যে দুটি অদ্ভুত গভীর রহস্যময় ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম সে দুটিও এক জাতের নয়। তবু মনুভাই যুগলভাই জুয়েলার্সের দোকানের নাম শুনলেই মুখরাম মঙ্গলদাস সিণ্ডিকেটের কথা আমার কেন যে সকলের আগে মনে পড়ে তা ঠিক বুঝতে পারি না।

দুটোই আমাদের কানে কিছুটা অনভ্যস্ত অবাঙালী নাম বলে যে স্মৃতিতে একসঙ্গে জট্ পাকিয়ে গেছে, তা বোধহয় নয়।

কলকাতা শহরের রাস্তায় নাকে দড়ি দেওয়া বলদের মত যার পেছনে ছুটে নাকালের একশেষ হতে হয়েছে সেই লীনা দেবির সঙ্গে বালিয়াড়ির রাজ্যের সদ্য কৈশোর পার হওয়া আনন্দ প্রতিমা আদমজির মেয়ে শমিতার চেহারা ও চরিত্রে ত নয়ই এমনকি বয়সেও কোন মিল নেই। তা সত্ত্বেও দু জনের দুটি কাহিনী যেন পরন্দরের পরিপূরক। চাটনির সঙ্গে পাঁপরভাজার মত একটির পরে আরেকটি না সাজালে কোথায় মস্ত যেন একটা খুঁত থেকে যায়।

কলকাতা শহরের শাহাজাদা হোটেলের আলো ঝলমল নাচ-গান বাজনা আর স্ফূর্তির হুল্লোড়ে সরগরম ডাইনিং হল থেকে তাই সোজা বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে নির্জন ধু ধু বালির ঢেউ তোলা তেপান্তরে গিয়ে উঠছি .....

www.boiRboi.blogspot.com

'দূরে একটা বালিয়াড়ীর পাশে একটা ছায়া যেন সরে গেল। কিসের ছায়া তা হতে পারে? ধু-ধু বালির রাজ্য, কিন্তু এখানে কোন হিংস্র শ্বাপদ গোছের প্রাণী আছে বলে ত' কখনও শোনা যায় নি। হয়ত মনের ভুল, ভেবে আবার জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলাম।

সবচেয়ে কাছের আশ্রয় মিলতে পারে জাখাও-তে। শহর তো নয়ই, ঠিক গ্রামও বলা চলে না। কয়েক ঘর জেলে আর কিছু নুন তৈরির মজুর সেখানে থাকে। নুনের কারবারী মনসুখলালজীর একটা কাছারি-ঘর গোছের সেখানে আছে।

অন্ততঃ মাইল চারেক হাঁটতে হবে সেখানে পৌঁছতে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সূর্যাস্ত হয় বেশ একটু দেরীতে। কলকাতার তুলনায় অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক বাদে। মনের মধ্যে সেই ধারণাটা ছিল বলেই একটু বেশী অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও চার মাইল যেতে অন্ততঃ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। এদিকে সূর্য পশ্চিমের সমুদ্র প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে।

অন্ধকারে প্রথমত দিকচিহ্নহীন এই বালুকারাজ্যে পথ চিনে যাওয়াই মুস্কিল। তাও পশ্চিমে সমুদ্রের নিশানাটা থাকায় হয়ত খুব কঠিন হত না। কিন্তু এই বিপদটা একটু ভাবিয়ে তুলল।

ব্যাপারটা কি হতে পারে একটু অনুমান করতে পারছিলাম বলেই দুর্ভাবনাটা অত বেশী।

মনসুখলালজি একবার একটু সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি একরকম হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'এই ধু-ধু বালির দেশে থেকে থেকে তিলকে তাল করে

www.boiRboi.blogspot.com

চলে যাবার পর সময় কাটাবার ছুতোর সন্ধান করে তাকেও পিছন থেকে ডেকেছি। সস্তায় স্মাগ্‌ল্‌ড মালের স্বরূপ জানা সত্ত্বেও অনাড়ির মত তার সঙ্গে দরদস্তুর করেছি বেশ খানিকক্ষণ ধরে। দরাদরি করতে করতে সামনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাটা তার কাছেও ঠিক গোপন রাখতে পারি নি। ফেরিওয়ালা সেটা আমার পুলিশ সম্বন্ধে শঙ্কিত সাবধানতা বলে ধরে নিয়েছে বলেই রক্ষে। লোভের সঙ্গে আমার ভয়টাকেও আরো উস্কে দেবার চেষ্টা করে সে গম্ভীর চাপাগলায় বলেছে,—তাড়াতাড়ি করুন স্যার। দেড়শ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় ছাড়ছি, আর কি চান? কখন কোথা দিয়ে কে হানা দেবে তার ত ঠিক নেই। শাদা পোশাকে সব ঘুরছে। দেখে চিনতেও পারবেন না। নিন স্যার যা বলবার বলে ফেলুন।

কিছুক্ষণ সময় কাটাবার ফন্দিটা সফলভাবে খাটিয়ে ফেরিওয়ালাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করেছি তারপর। তাড়াতাড়ি যাতে কেটে পড়ে তার জন্যে দেড়শ টাকার স্মাগ্‌ল্‌ড মালের দাঁও মারা দাম পঞ্চাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছি পাঁচে। গালাগাল না হোক একটা কান লাল করবার মত জবাবের জন্যেই প্রস্তুত ছিলাম। তার বদলে হ্যাঁ—তার বদলে পকেট থেকে করকরে একটি পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়ে সেই রাঙতামোড়া অমূল্য স্মাগ্‌ল্‌ড মালটি গ্রহণ করতে হয়েছে। ভদ্রলোকের কথার খেলাপ করবার সুযোগ ফেরিওয়ালা আমায় দেয় নি।

এক দাঁও-এ একেবারে একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা লাভ করার ধাক্কা সামলাতে খানিকক্ষণ গেছে। কোনো কিছু কিন্তু তখনও ঘটে নি। পুরানো 'হোয়াইট ওয়ে লেডল' বাড়ির গম্বুজ ঘড়িতে দুটো বাজার পর একটু অস্থির ও চিন্তিত হয়েছি।

সত্যিই লক্ষ্য রাখবার মত কিছু ঘটে নি, না, আমারই সজাগ পাহারার ত্রুটি?

ইঙ্গিত যা পেয়েছিলাম তাতে বেলা দুটোর মধ্যেই ত কিছু না কিছু হবার কথা।

তাহলে এবার কি আমার রণে ক্ষান্ত হওয়াই উচিত ?

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আর খানিক এদিক-ওদিকে পায়চারী করলাম।

ঘড়ির বড় কাঁটাটা পাঁচ ছাড়িয়ে দশের দাগে গিয়ে পোঁছেছে। আর মিথ্যে টহল দেবার কোনো মানে হয় না। দুনিয়াটা সত্যিই গোয়েন্দা গল্পের স্বর্গ নয়, যে থেকে থেকে যেখানে-সেখানে রোমাঞ্চের শিহরণ লাগাবার তোড়জোড় চলেছে।

ভাবনাটা মনে ভেসে উঠতে না উঠতেই শরীরটায় শিহরণের ঢেউ খেলে গেল।

ওই ত, যার জন্যে এই উদ্বিগ্ন অপেক্ষা, ওপারে মেট্রো সিনেমার সামনেই সে দাঁড়িয়ে। কেমন একটু উদ্ভ্রান্ত অস্থির ভাব সত্যিই।

ভাড়াটে গাড়ির ড্রাইভারকে শেষ নির্দেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হবার জন্যে পূব দিকের সীমানার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পথের ধারে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকের চৌরঙ্গী সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ের ট্রাফিক ছেড়ে দিয়েছে। স্রোত বইছে বাস, লরী মোটরের। এর ভেতরে দিয়ে ওপারে যাওয়া অসম্ভব।

এত কষ্টের শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না কি এই সুযোগে ?

না, এদিক-ওদিক চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করে মেট্রোর ভেতরে টিকিটের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডান দিকের অ্যাডভান্স টিকিটের কাউন্টার। সেখান একটু দেরী হবে নিশ্চয়। তার মধ্যে রাস্তা পার হয়ে যাব। আর তা না পারলেও এপার থেকে লক্ষ্য রাখতে পারব ঠিকই।

একবার দেখলে ও চেহারার ওপর নজর রাখার বিশেষ অসুবিধে নেই। দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত কেউ নয়। দূর থকেই চেহারার বিশেষত্বটা মনে একেবারে ছাপ দিয়ে যায়।

রাজ্যে আমার মত প্রায় হা-ঘরে মানুষের উপর কেউ কেন হানা দিতে পারে তা ভেবে পাইনি।

আর দিচ্ছেই বা কারা?

এ মরুভূমির দেশে এমন কিছু নেই যার লোভে খুনে ডাকাতের দল এখানে গুপ্ত ঘাঁটি বসাতে পারে। এখানকার একমাত্র সম্পদ তো নুন, আর কিছু জিপ্‌সম। জাখাও-এর কাছে মনসুখলালজির তাই সংগ্রহ করারই কারবার।

এরকম দুশমনের এ অঞ্চলে থাকা যত রহস্যময়ই হোক তাদের হাত থেকে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। মনে মনে মরিয়া হয়ে ঠিক করে ফেললাম যে চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে পিস্তল ছুঁড়তে দ্বিধা করব না। তাতেও অবশ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার কোন আশা নেই। আমার হাতে মারাত্মক ভাবে জখম হবার জন্যে তিনজনেই একসঙ্গে নির্বোধের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা নিশ্চয় করবে না। বড়জোর একজনকেই পিস্তলে কাবু করবার সুযোগ আমি পেতে পারি। চরম মুহূর্তের জন্যে সে উপায় মুলতুবী রেখে আপাতত আর একটা ফন্দি খাটাবার চেষ্টা করলাম।

সামনের বা পেছনের দিকে না গিয়ে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে ডাইনে দ্রুতপদে হাঁটা শুরু করলাম।

ডাইনে মানে—পূবদিকে। সেদিকেও লুকোবার আশ্রয় কোথাও মেলবার নয় আমি ভাল করেই জানি। পিছনে দক্ষিণ দিকেও যেমন, ডাইনে—পূবদিকেও তেমনি প্রথমে ধু ধু বালির রাজ্য আর তারপর সেই বিখ্যাত, 'রান্ অফ কচ'। আক্টোবর মাসের শেষে এখনই সে 'রান' বেশীর ভাগ জায়গায় শুকনো কঠিন পাথর হয়ে জমে গেছে। দু-একটা নোনা জলা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। সামনে বা পেছনে যাওয়া বা বাঁদিকের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার মতই পূবদিকে এই পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা নিষ্ফল। শুধু একটা কাজ তাতে হতে পারে।

www.boiRboi.blogspot.com

আর কিছু না হোক আমার এই নতুন চালে দুশমনেরা বিভ্রান্ত হবে সন্দেহ নেই। তাদের নিজেদের ফন্দি বেশ একটু ভেস্তে যাবে। এমন কথাও তাদের পক্ষে ভাবা অসম্ভব নয় যে পূবদিকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আমি যাচ্ছি। সেখানে কোন না কোন সাহায্যের ভরসা আমার আছে।

দুশমনদের তাড়াতাড়ি একটা নতুন ফন্দি এবার আঁটতেই হবে! কোনরকমে সূর্যাস্তের একটু পরে পর্যন্ত তাদের এড়াতে পারলে অন্ধকারে আমি যে পালাবার বেশী সুযোগ পাব এটুকু বুঝতে তাদের দেরী হবে না। যা করবার তা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার সিদ্ধান্ত তাই তাদের নিতেই হবে।

আমার হিসেবে খুব যে ভুল হয়নি খানিক বাদেই তা টের পেলাম। তিনটে মূর্তিকে এতক্ষণ ছাড়া-ছাড়া ভাবে আলাদা জায়গাতেই দেখেছিলাম। এবারে কিছুদূর গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তারা এক জায়গাতেই জড়ো হয়েছে। আমার সম্বন্ধে কি করা যায় পরামর্শ করবার জন্যেই যে তাদের একত্র হতে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমার পেছনে পশ্চিমের সমুদ্ররেখা আর দেখা যাচ্ছে না। অস্তসূর্য কিন্তু সে সমুদ্রে যে ডুবতে শুরু করেছে তার পড়ন্ত রক্তিম আলো দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। কোনরকমে আর আধঘণ্টাটাক কাটাতে পারলেই এ যাত্রায় প্রাণে বাঁচবার সামান্য একটু আশা করতে পারব। সামনে মাইলখানেক দূরে অপেক্ষাকৃত উঁচু একসারি বালির ঢিবি দেখা যাচ্ছে। ওই ঢিবিগুলোর কাছে পৌঁছলেই দুশমনদের চোখের আড়াল থেকে একটু সরবার সুযোগও পাওয়া যাবে।

কথাটা মনে হওয়া মাত্র সেদিকে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম। এক মাইল একটানা ছোটার অভ্যাস কোনকালেই ছিল না। মাঝপথেই হয়তো হাঁফিয়ে থেমে যেতে হবে। কিন্তু আমায় যারা

www.boiRboi.blogspot.com

অনুসরণ করছে তারাও কেউ পেশাদার দোড়বাজ নিশ্চয়ই নয়, তারাই বা কতদূর দম রাখতে পারে দেখা যাক। দৌড়তে দৌড়তে একবার চকিতে পেছন ফিরে দেখে বুঝলাম দুশমনেরা রীতিমত হকচকিয়ে গেছে। তাদের একজন আপনা থেকে আমার পেছনে ছুটতে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু আর একজনকে তাকে টেনে থামাতে দেখলাম।

এখনও তাহলে আশা কিছু আছে। বালির ওপর দিয়ে দৌড়নো বেশ কষ্টকর। আর্ধেক কেন সিকি পথ যেতে না যেতেই হয়তো চরম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে হবে। তবু তখনকার মত বেগ কমালাম না।

পরমুহূর্তেই পেছন থেকে একটা শিস দেওয়া শব্দের সঙ্গে আমার পাশের বালিতে কি একটা জিনিস গেঁথে গেল। চমকে সেদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল না। এই সম্ভাবনার কথাটাই ভাবতে পারিনি।

বন্দুকের গুলি নয়, তীরের ফলা। দুশমনেরা শিকারকে হাত ফসকে যেতে দেখে তীর ছুঁড়ছে। লক্ষ্য তাদের প্রায় অব্যর্থ। প্রথমটা অল্পের জন্য ফসকেছে কিন্তু তার পরেরগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে আশা করা বৃথা।

কাছাকাছি একটা ছোটখাট ঢিবিও নেই যার আড়ালে কিছুটা আত্মরক্ষা করা যায়। আর থাকলেই বা কি হত, ওভাবে আত্মরক্ষা করবার চেষ্ট করলে দুশমনদের আরও সুবিধেই হত এসে ঘিরে ধরবার।'

পরাশর থামল।

হেসে বললাম, "বেশ একটা গাঁজাখুরি থ্রিলার সাজিয়েছ তো?"

"গাঁজাখুরি কেন হবে?"—শমিতা আমার ওপর একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বললে, "ব্যাপারটা সত্যি, না চাচাজী?"

www.boiRboi.blogspot.com

পরাশর তখন মুচকে মুচকে হাসছে।

যেখানে বসে গল্প হচ্ছিল সেটাও ধু ধু বালিরই রাজ্য। সামনে ঠিক চোখে দেখা না গেলেও কিছু দূর থেকে ফেনায়িত নীল সমুদ্রের গর্জনও শোনা যাচ্ছে।

ঠিক এখনকার ঘটনা নয়, এক যুগের বেশী আগেকার কথা। কোনারকে তখন গো-যানে ছাড়া যাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

আদমজি পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে গুটি পাঁচেক বড় বড় গো-যান ভাড়া করে কোনারক দেখতে গিয়েছিলাম। কোনারকে পৌঁছে যা দেখবার বিকেল পর্যন্ত দেখা সেরে তিনজনে মিলে কিছুদূরে বেড়িয়ে আসতে বার হয়েছি। সঙ্গে তাঁবু ইত্যাদির সরঞ্জাম ছিল। রাতটা ঐখানেই কাটিয়ে পরের দিন সকালে রওনা হওয়া হবে এই ঠিক ছিল। নিশ্চিন্ত হয়েই তাই টহল দিতে যেতে পেরেছিলাম।

বার হতে হয়েছিল শমিতারই পেড়াপীড়িতে। শমিতা নামটা শুনে বাঙালী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শমিতা বাঙালী নয়। আদিবাসের দিক দিয়ে কাথিয়াওয়াড়ি মঙ্গলদাস আদমজির একমাত্র মেয়ে।

আদমজি বোম্বাইএর আমদানী রপ্তানির মাঝারি গোছের ব্যবসাদার। পরাশরের তার সঙ্গে কি সূত্রে আলাপ হয়েছিল ঠিক জানি না। আলাপটা খুব ঘনিষ্ঠই হয়েছিল নিশ্চয়। সম্প্রতি ব্যবসারই কোন কাজে আদমজি কলকাতায় এসেছিলেন। উঠেছিলেন সকন্যা 'গ্রেট ইস্টার্নে' একটি 'স্যুইট' নিয়ে। পরাশরকে সেখানে প্রায় প্রত্যহই যেতে হয়েছে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে সে আদমজি ও শমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। যে কাজে কলকাতায় এসেছিলেন তা শেষ হবার পর শমিতা সোজাসুজি বোম্বাই ফিরতে চায়নি। ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক সম্বন্ধে তার

www.boiRboi.blogspot.com

একটা বিশেষ আগ্রহ আছে। বাবার কাছে তাই এসব জায়গা না দেখে সে যাবে না বলে বায়না ধরেছিল।

আদমজিকে মেয়ের অনুরোধ রাখতে হয়েছে। সেই সঙ্গে পরাশর ও আমাকে সঙ্গী হবার এমন সনির্বন্ধ অনুরোধ তিনি করেছেন যে তা এড়ানো আর সম্ভব হয়নি।

প্রথমে ভুবনেশ্বরে যা দেখবার দেখা সেরে আমরা পুরীতে তখনকার বি. এন. আর. হোটেলে গিয়ে উঠেছি। সেখান থেকে এলাহি আয়োজন করে এই কোনারকে আসা। তখনকার দিনে ওরকম সমারোহ করে কোনারক দেখতে যাওয়ার যাত্রীদল বিরল ছিল।

একটি ছোট বালির ঢিবির ধারে আমরা তখন বসে আছি। মানুষ কি পশুপাখীর উপদ্রব নেই বলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বালি যেন দুধে ধোওয়া।

একটা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় পরাশর তার গল্প বলছিল। আমিও পেছনের ঢিবিতে একটু হেলান দিয়ে ঈষৎ কৌতুকভরে সে গল্প শুনছিলাম।

শমিতাই শুধু টান হয়ে বসে তীব্র আগ্রহের সঙ্গে সব কথা যেন গিলছিল।

বয়েসে নেহাৎ ছেলেমানুষ না হলে তার চোখমুখের উত্তেজনা একটু অস্বাভাবিকই মনে হত।

সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় শরীর অপেক্ষাকৃত বেশী পরিপুষ্ট বলে শমিতাকে বয়সের তুলনায় প্রথম দেখলে একটু বড়ই মনে হয়। কিন্তু মুখের দিকে চাইলেই সে ভুল কাটে। সে যে কৈশোর থেকে সবে যৌবনে পা দেব দেব করছে তার মুখের সরল কোমল লাবণ্যতেই তা বোঝা যায়।

আদমজির কাছেই জেনেছি শমিতা সবে পনেরো পার হয়ে ষোলতে পড়ছে। মা-মরা মেয়ে আদমজির একেবারে নয়নের মণি। আদমজি তার মুখ থেকে কথা খসবার অপেক্ষা রাখেন না।

www.boiRboi.blogspot.com

এত আদর আশকারা সত্ত্বেও শমিতা কিন্তু অসভ্য বেয়াড়া কিছু হয়ে যায়নি। এ ক'দিন একসঙ্গে থেকে তার স্বভাবের মিষ্টতায় সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি।

পরাশরের সঙ্গে তাদের পরিবারের পরিচয় কম দিনের নয়। ছেলেবেলা থেকে পরাশরের সে ভক্ত ছিল সন্দেহ নেই। এবারের টহলে এসে সে ভক্তিটা অনেক গুণ বেড়েছে। তার প্রধান একটা কারণ পরাশরের কাছে গল্প শোনার আকর্ষণ।

এই ধু ধু বালুর নির্জনতায় এসে শমিতার বায়না মেটাতেই বোধ হয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই পরাশর ঐ গল্প শুরু করেছিল।

গল্পের অমন রোমাঞ্চকর মুহূর্তে এসে থেমে তাকে মুখ টিপে হাসতে দেখে আমি বিদ্রূপের একটু খোঁচা দিয়ে বললাম, "কি রকম সত্যি বুঝতে পারছ না? এর পরে কি হবে এখনও ভেবে ঠিক করতে পারেনি।"

"না, না চাচাজী।"—শমিতার গলায় মিনতি, "বল এ গল্প মিথ্যে নয়।"

একটু থেমে শমিতা জোর দিয়ে বললে, "আমি জানি এ গল্প সত্যি।"

"কেমন করে জানলে?"—আমি হেসে বললাম, "জমাট হলেই যদি সত্যি হয় তাহলে দুনিয়ার সব থ্রিলার আর ডিটেকটিভ বানানো গল্পই তো সত্যি বলে ভাবতে হয়।"

শমিতা কি উত্তর দিত জানি না কিন্তু আগেই পরাশর স্নেহভরে আর একটা প্রশ্ন করলে।

শমিতার দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "এ গল্প যে বানানো নয়, সত্যি, তা কি করে জানলে বল ত?"

শমিতার মুখখানা এক মুহূর্তের জন্যে কি রকম যেন হয়ে গেল। তারপর একটু যেন ইতস্ততঃ করে সে বললে, "কেমন করে জানলাম

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমি যেন ঠিক এই রকম সব ব্যাপার স্বপ্নে দেখেছি।"

এবার আমার সঙ্গে পরাশরও একটু হেসে উঠল, তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "স্বপ্নে যা দেখা যায় তা সব কি সত্যি হয় ?"

"হয়, হয়।" শমিতা জোর দিয়ে বললে, "এখান থেকে পুরীর হোটেলে ফিরে যাবার আগেই একটা কিছু যদি হয় তখন তো স্বীকার করবে ?"

"কি স্বীকার করব ?" একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শমিতাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে পরাশর, "স্বপ্ন যে সত্যি হয় তার প্রমাণ এখানেই পাব বলছ ? কি প্রমাণ ? কি স্বপ্ন তুমি দেখেছ ?"

"তা আমি ঠিক বলতে পারব না।" শমিতা যেন অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল, "তবে স্বপ্ন যে সত্যি হয় তার প্রমাণ আগেও যে পেয়েছি তা তো তুমি জান। বাবা তোমায় বলেন নি ?"

এবার পরাশরের চোখমুখেই কেমন একটু অস্বস্তি দেখা গেল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর হেসে উঠে সে বললে, "ও—সেই উড়ো চিঠিটার কথা ? সেই চিঠির সঙ্গে স্বপ্ন সত্য হবার কি সম্বন্ধ ? স্বপ্নে তুমি ওরকম চিঠি নিশ্চয়ই দেখনি ?"

"না, চিঠি দেখিনি, কিন্তু একজন দৈত্য আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে বলে শাসাচ্ছে—স্বপ্ন দেখেছিলাম।"

"সেদিন কোন সস্তা গোয়েন্দা গল্প-টল্প পড়েছিলে বোধ হয়।" আমি হেসে বললাম। "ওরকম ভয়ের স্বপ্ন সবাই এক-আধদিন দেখে।"

"হ্যাঁ, ও চিঠি কোন চ্যাংড়া বদমাশ ভয় দেখিয়ে সস্তা রসিকতা করবার জন্যে নিশ্চয় লিখেছিলো।" পরাশর আমাকেই সমর্থন করে শমিতাকে আশ্বাস দিলে, "তোমার স্বপ্নের সঙ্গে ও চিঠির কোন সম্পর্কই নেই।"

"খুব আছে।" শমিতা আবার দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললে,

"চিঠির একটা লাইন নিশ্চয়ই মনে আছে, ঐ যেখানে লিখেছে,—ধু-ধু বালিতে অতীতের কঙ্কাল চিরকাল পোঁতা থাকবে না। ঐ বালির কবর ঠেলে উঠেই সে এবার শোধ নিতে যাচ্ছে। তোমার কাছে যা সবচেয়ে দামী তাই কেড়ে না নিয়ে সে ছাড়বে না।"

শমিতা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, পরাশর তাকে থামিয়ে একটু ভর্ৎসনার সুরে বললে, "চিঠির কথাগুলো একেবারে মুখস্থ করে রেখেছ দেখছি। খুব অন্যায় শমিতা, খুব অন্যায়! আদমজির এ চিঠি তোমাকে দেখানো অন্যায় হয়েছে।"

"বাবা তো দেখান নি।" প্রতিবাদ জানালে শমিতা, "বাবার তখন অসুখ, ওঁর সব চিঠি আমি খুলে ওঁকে পড়ে শোনাই। বেশ দামী খামে জরুরী ছাপ মেরে এসেছিল বলে কারবারের দরকারী চিঠি মনে মনে করে খুলে পড়েছিলাম।"

"পড়েই তো বোঝা উচিত ছিল," পরাশর চোখেমুখে কৌতুক ফুটিয়ে বললে, "কেউ বাঁদরামী করে ওরকম জঘন্য রসিকতা করেছে। বালির কবর, কঙ্কাল, সবচেয়ে দামী জিনিস কাড়া এ সব তো মুখ্যু হাঁদাদের কল্পনা। ওসব কখনও সত্যি হয়?"

"বেশ তো, হয় কিনা দেখুন না।" শমিতা বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে বললে, "তাই দেখবার জন্যেই তো বাবাকে জোর করে এই কোনারক দেখতে আসতে রাজী করিয়েছি। এখানেও যে ধু-ধু বালির রাজ্য তা আমি একটা ভ্রমণ কাহিনী পড়েই জেনেছিলাম।"

এবার আমার মত পরাশরকেও স্তম্ভিত দেখলাম। বিস্মিতভাবে শমিতার দিকে চেয়ে সে প্রায় অবিশ্বাসের সুরে বললে, "এইজন্যে তুমি পুরী কোনারক দেখতে আসার বায়না ধরেছিলে? আগে জানলে কিছুতেই তোমার বাবাকে রাজী হতে দিতাম না।"

"সেইজন্যেই তো আসল কারণ কিচ্ছু কাউকে জানাই নি।"

www.boiRboi.blogspot.com

শমিতার মুখে এবার একটু দুষ্টুমির হাসি দেখা গেল। "আপনাদের সঙ্গে আনবার জন্যেও সেইজন্যেই জেদ করেছি।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পরাশর গম্ভীর মুখে বললে, "নাও চলো, এখন ফেরা দরকার।"

"কিন্তু তোমার গল্পটা?" বললে শমিতা।

"গল্প পরে বলব।" পরাশর একটু চিন্তিত মুখে তখন এগিয়ে চলেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি থেকে বালি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে পরাশরের কাছে ছুটে গিয়ে শমিতা তার একটা হাত ধরে আবদারের সুরে বললে, "পরে কেন? এখনই বল।"

"বেশ, তাই বলব। কিন্তু এখানে তো নয়। তাঁবুতে চল।"

আমি পেছনে পেছনেই যাচ্ছিলাম। শমিতা পরাশরকে ছেড়ে আমার দিকে ফিরে একটু অদ্ভুত ভাবে হেসে বললে, "দেখছেন তো চাচাজীও ভয় পাচ্ছে।"

পরাশর ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে শমিতাকে কাছে টেনে স্নেহের স্বরে বললে, "পাগল মেয়ে, আমি কি এই ধু-ধু বালির নির্জনতায় ভয় পাচ্ছি! আমি ভয় করছি তোমাকে।"

"আমাকে!" শমিতা অবাক হয়ে পরশরের দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ," পরাশর স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, "এইসব আজগুবি কল্পনাকে যদি তুমি প্রশ্রয় দাও তাহলে তুমি নিজেই নিজের ক্ষতি করবে।"

"আজগুবি কল্পনা নয় চাচাজী। আমি···আমি ··"

কি যেন বলতে গিয়ে শমিতা থেমে গেল।

পরাশর তার দিকে কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে, "আমার কাছে কিছু লুকিও না শমিতা। ঐ স্বপ্ন দেখা ছাড়া অন্য কোন কিছু যদি তোমার মনে ভয় জাগিয়ে থাকে তাহলে আমায় বলতে দ্বিধা কোর না।"

www.boiRboi.blogspot.com

শমিতা মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পরাশর আবার বললে, "আমার কাছে বলতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়। যা আমায় বলতে চাইছ না আদমজিকে তা বলেছ কি?"

শমিতা নীরবে মাথা নাড়ল।

আমি এবার একটু দ্বিধাভরে বললাম, "আমার সামনে বলতে হয়ত আপত্তি আছে। আমি আগে তাঁবুতে চলে যাচ্ছি।"

"না না, আপনার সামনে বলতে কোন আপত্তি নেই।" শমিতা ব্যাকুল ভাবে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, "আমি যা বলব তা হয়ত বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

"বিশ্বাস না করতেই আমরা চাই।" পরাশর ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার চেষ্টায় একটু কৌতুকের স্বরে বললে, "আমাদের বললে তোমার নিজের ভুল বিশ্বাসটাও ভেঙে যেতে পারে। বল কি হয়েছে?"

শমিতা তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে যেন উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, "ছায়ার মত যে আমার পিছু নিয়েছে তাকে এখানেও আমি দেখেছি।"

"কাকে দেখেছ? কখন?" পরাশর তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

"এই আজই ভোরবেলা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটু সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলাম! তখনও আপনারা সবাই তাঁবুতেই বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।"

"না ঘুমোই নি।" আমি এখনও প্রসঙ্গটা সহজ রাখবার চেষ্টায় স্বাভাবিক স্বরে বললাম, "বিছানায় বসে চা খেতে খেতে পরাশরের কাছে তখন আমি তোমার বাবার কারবারের গল্প শুনছিলাম।"

"তখনও তো আলো ভালো করে ফোটেনি", পরাশর বললে, "অত ভোরে বেরিয়ে আমাদের কাউকে ডাকোনি কেন?"

"ঘুম ভাঙিয়ে আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি। তা ছাড়া এরকম অদ্ভুত নির্জনতায় একলা বেড়াবার একটু লোভও ছিল।"

সূর্যাস্তের আলো এখন সমস্ত বালির রাজ্যের ওপর একটা রক্তিম আভা ফেলেছে। সেই আলোর দরুন কিনা জানি না, শমিতার সরল লাবণ্যময় মুখখানা কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে বলে মনে হল।

সেই সঙ্গেই একটা আতঙ্কের তীব্রতা তার বিস্ফারিত চোখে ফুটে উঠে গলা দিয়ে আর্ত চিৎকার বার হল,—"ঐ! ঐ! ওকেই আজ ভোরবেলায় দেখেছি।"

শমিতার মুখটা পশ্চিমের বালুকাবিস্তারের দিকেই ফেরানো ছিল। আমাদের দু'জনের মুখ ছিল উল্টো দিকে। শমিতার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে দুজনেই আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় অসীম বালির সমুদ্র। মাঝে মাঝে বালিয়াড়ীগুলো যেন সেই উত্তুঙ্গ সমুদ্রের ঢেউ। সমস্ত দিগন্তটা অস্তে যাওয়া সূর্যের আলোয় যেন রক্তে ছোপানো।

কিন্তু কোথাও কোনকিছুর চিহ্ন ত' নেই। মানুষ দূরে থাক, একটা পশুপাখী কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

"কোথায়? কি তুমি দেখলে?" উত্তেজিত ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ঐ, ঐ দূরের বালিয়াড়ীটার আড়ালে সে এইমাত্র সরে গেল।" শমিতা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে প্রায় দু'শো গজ দূরে একটা উঁচু বালির ঢিবি দেখালো। এক মুহূর্ত দেরী না করে তৎক্ষণাৎ সেই বালিয়াড়ী লক্ষ্য করেই ছুটলাম। পরাশর সবার আগে।

পিছন থেকে শমিতার কাতর কণ্ঠ শোনা গেল, "দাঁড়াও চাচাজী, দাঁড়াও। অমন অসাবধানে ছুটে যেও না। যদি সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু হয়।"

www.boiRboi.blogspot.com

পরাশর তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটু হেসে নিজের অবিবেচনাটা স্বীকার করে বললে, "হ্যাঁ, অমন দৌড়ে যাবার কোন মানে হয় না। এখান থেকে সামনের দিগন্ত পর্যন্ত সব এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও অন্ধকার হবার অনেক আগেই দশ মিনিটে ওখানে আমরা পৌঁছে যাব। বালিয়াড়ীর আড়ালে যদি কেউ বা কিছু লুকিয়ে থাকে তাহলে ওখান থেকে সরে যাবার চেষ্টা করলেই আমাদের চোখে পড়বে। কোথাও তার পালাবার উপায় নেই।"

ধীরেসুস্থে সাবধানে এবার এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে পরাশরের হাতে একটা জিনিস দেখে একটু অবাক হলাম। ধরবার ছোট একটা কাঠের হাতলের মাথায় লম্বা চাবুকের মত জড়ান একটা জিনিস।

"এটা আবার কি?" জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে।

"কিছু নয়। আত্মরক্ষার সামান্য একটু সহায়।" পরাশর হেসে জানাল, "শমিতা সঙ্গে আছে বলেই বার করতে হল।"

"ওটা বুঝি তোমার সঙ্গেই থাকে চাচাজী?" শমিতা শঙ্কা বিস্ময় মেশানো গলায় বললে, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওদিকে আর না যাওয়াই ভাল। আমি হয়ত ভুল কিছু দেখেছি।"

"ভুল যদি কিছু দেখে থাক তাহলেও তো যাওয়া দরকার। ভুলটা যাতে প্রমাণ হয়ে যায়।" বললে পরাশর।

তখন বালিয়াড়ীটার কাছেই আমরা এসে পড়েছি। পাহাড় পর্বত নয়, ছোটখাট একটা ঢিবি গোছের। তবে তার পেছনে গোটা দুই মানুষ কি জন্তু জানোয়ার অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে।

এই পর্যন্ত আসতে আসতে শমিতার দৃষ্টিবিভ্রমের একটা কারণ আমি অনুমান করে ফেলেছি। শমিতা একেবারে ভুল কিছু দেখেনি। যা দেখেছে তা অবশ্য ভূত প্রেত মানুষ নয়,

কোন জন্তু-টন্তুই হবে। গোবাঘা যাকে বলে সেই হুড়ার বা হায়না হওয়াই সম্ভব। এ অঞ্চলে ও জন্তুটা একেবারে বিরল নয় বলে শুনেছিলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

পরাশরেরও ধারণা সেইরকম ছিল কিনা বলতে পারি না কিন্তু কাছাকাছি একটা বড় গোছের নুড়ি সে আমায় কুড়িয়ে নিতে বললে! নুড়িটা ঠিক সমুদ্রতীরের নয়, তীরের ওপর অস্থায়ী উনুন গড়বার জন্যে কেউ বোধহয় কয়েকটা বয়ে নিয়ে এসে সাজিয়েছিল। আগুনের কালির দাগ লাগা একটা জুতসই নুড়ি তুলে নিয়ে পরাশরের নির্দেশ মত দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিক দিয়ে ঢিবিটার অন্যদিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হলাম। একদিকে আমি একলা আর একদিকে পরাশর আর শমিতা!

প্রায় একসঙ্গেই ঢিবির ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু কোথায় কি?

ভূতপ্রেত মানুষ তো নয়ই, কোন জন্তু জানোয়ারও সেখানে নেই।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণই তাহলে শমিতার দেখার ভুল!

শমিতাকে কেমন একটু লজ্জিত মনে হল। মুখটা কাঁচু-মাচু করে বললে, "আমি কিন্তু আজ ভোরবেলার মতই কি একটাকে এই বালিয়াড়ীর পেছনে সরে যেতে দেখেছি। দু-দুবারই এরকম দেখার ভুল আমার হল কেন?"

শমিতা যেন নিজের মনেই ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টায় বললে, "ভোরের বেলায় তবু আবছা অন্ধকার ছিল কিন্তু এখন তো লাল হয়ে এলেও সূর্যাস্তের আলোয় চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ও কি?"

শমিতার অস্ফুট ভয়ার্ত চিৎকারে পরাশর আর আমি দুজনেই চমকে সন্ত্রস্তভাবে তার মুখের দিকে চাইলাম।

সত্যি শমিতার মাথার দোষ কিছু হয়ে যাচ্ছে নাকি?

www.boiRboi.blogspot.com

তার মুখের দিকে চেয়ে চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে কিন্তু বুঝলাম অপ্রকৃতিস্থ সে নয়।

ঢিবিটার যেদিক থেকে আমি এসেছি সেদিকে বালির ওপর আমার ভারী জুতোর দাগের পাশে আর একটা খালি পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। পায়ের দাগ এই ঢিবিটার মাঝখানের দিকেই এসেছে। কিন্তু সেখানে এসে হঠাৎ আশ্চর্যভাবে একেবারে মিলিয়ে গেছে।

পায়ের দাগটা রীতিমত বিরাট ও খুব ভারী কোন মানুষের বলেই বোঝা যায়।

ঢিবিটার এদিকের বালিটা একটু নরম ও ভিজে গোছের। তাতে আমার জুতোর দাগ বেশ ভালভাবেই পড়েছে। কিন্তু খালি পায়ের দাগ আকারে আমার জুতোর ছাপের চেয়ে বড় তো বটেই, তা বালিতে বসে গেছে আরো গভীর ভাবে। খুব ভারী দেহ ছাড়া এরকম গভীর দাগ পড়তে পারে না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওই স্পষ্ট ভারী দাগও ঢিবিটার মাঝামাঝি পর্যন্তই দেখা যাচ্ছে। তারপর আর কোন চিহ্নই নেই।

এত গভীর দাগ যার পা থেকে পড়ে সে মানুষটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল কোথায়? কেমন করেই বা যেতে পারে?

আমরা তো তিনজনেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকে নজর রেখে ছুটে এসেছি। এই ঢিবির আড়াল থেকে কারুর কোনদিকে ছুটে পালানো অসম্ভব।

সমস্ত ব্যাপারটা শমিতার দেখার ভুল মনে করা যেত কিন্তু পায়ের এই দাগ দেখবার পর ব্যাপারটা শমিতার দৃষ্টিবিভ্রম মনে করার আর উপায় নেই।

অবিশ্বাস্য, অলৌকিক একটা কিছু ঘটেছে বলে মন মানতে চায় না। কিন্তু সামনে চাক্ষুষ যে প্রমাণ দেখা যাচ্ছে তার তো যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

পরাশর ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে নিজের চিবুকটা ধরে ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত তন্ময় হয়ে সেই পায়ের দাগটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুঝলাম আমার মতই এ রহস্যের কোন হদিশ না পেয়ে সে ফাঁপরে পড়েছে। বললাম, "পায়ের দাগটায় একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছ?"

কিরকম একটু অন্যমনস্ক ভাবে আমার দিকে মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি?"

বললাম, "শেষ দাগটা দেখলে বোঝা যায় এখান থেকে লাফ দিয়ে কেউ অন্তত পালাবার চেষ্টা করেনি। লাফ দিলে পায়ের গোড়ালী আর পাতার ছাপ সমান ভাবে পড়ত না। আঙুল সমেত সামনের পাতার ছাপই বেশী গভীর হত। ছাপটা দেখলে তাই মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেউ অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

"তুমি তো পায়ের ছাপগুলো ভাল করেই লক্ষ্য করেছ দেখছি।" পরাশর এতক্ষণে একটু হেসে প্রশংসার সুরে বললে, "সত্যিই পায়ের ছাপগুলো ভাবিয়ে তোলবার মত।"

"আমি তাহলে ভুল তো কিছু দেখিনি? সত্যিই কেউ এ ঢিবির আড়ালে এসেছিল?" কাতর ভাবে বললে শমিতা। যা দেখেছে তা যে তার চোখের ভুল নয় সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে যেন আরও বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে গেছে।

"হ্যাঁ, ঢিবির আড়ালে কেউ যে এসেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।" পরাশর শমিতাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "কিন্তু এখন আর এখানে থাকা বৃথা। অন্ধকার হবার আগেই ফিরতে হবে; চল।"

সত্যিই সূর্য ইতিমধ্যে ডুবে গিয়ে আকাশ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসতে শুরু করেছে।

পরাশর শমিতার পিঠে হাত দিয়ে আস্তানায় ফেরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। পিছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওটা কি করছ?"

www.boiRboi.blogspot.com

আমি তখন একটা পায়ের দাগের কাছে বসে মাপবার ফিতের অভাবে রুমালটা বার করে তাই টান করে ধরে দাগটার লম্বা চওড়া মাপ নিচ্ছি। বললাম, "এ দাগ তো কালকের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে তাই মোটামুটি একটা মাপ নিয়ে রাখছি।"

তার নিজেরই করণীয় এ কাজটা ভুলে যাওয়ায় পরাশর মনে মনে একটু লজ্জা পেল মনে হয়। সেইটে ঢাকতেই বোধহয় বললে, "না, ভিজে মিহি বালি, একদিনে ও ছাপ নষ্ট হবার নয়। তাছাড়া ঐ পায়ের ছাপের মাপ থেকে আসল পা বা তার মালিকের হদিশ পাওয়া কঠিন। ঢিবির মাঝখান থেকে হঠাৎ পায়ের দাগ মিলিয়ে যাওয়ার রহস্যটাই আসল।"

বললাম, "তবু মাপটা নিয়ে রাখলে ক্ষতি তো নেই।"

ক্ষতি যে নেই পরাশরের পরের কৌতূহলী প্রশ্নে তা বোঝা গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "কি মাপ পেলে?"

বললাম, "প্রায় দু' বিঘৎ লম্বা আর আট আঙুল চওড়া। সেই যে অশ্বত্থামার গুজব উঠেছিল এ যেন তারই পা।"

আমার রসিকতার চেষ্টাটা মাঠেই মারা গেল। সেটা উপভোগ করবার অবস্থা কারুরই নয়। শমিতা কেমন একটু আতঙ্ক-বিহ্বল আর পরাশর কি একটা ভাবনায় একেবারে তন্ময়।

সেই অবস্থাতেই তাঁবুতে ফিরে গেলাম।

পরাশর রাস্তায় শুধু একটা অনুরোধ করেছিল, "এখনই গিয়ে এ ব্যাপারটা আদমজিকে কিছু যেন না জানান হয়।"

শমিতা পরাশরের কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিন্তু বাবাকে না বলাটা কি ঠিক হবে?"

"তোমার বাবাকে বলতে হবে তো নিশ্চয়ই।" পরাশর শমিতাকে বুঝিয়েছিল, "কিন্তু আজকে নয়। আর দু'দিন একটু দেখে।"

www.boiRboi.blogspot.com

দু'দিনের জায়গায় আরও চারদিন ঐ বালিয়াড়ীর রাজ্যে তাঁবু ফেলে আমরা কাটিয়েছি। এ চারদিনেও আদমজীকে পরাশরের নির্দেশে শমিতা বা আমি কেউ কিছু জানাইনি। দু'দিনের জায়গায় চারদিন থেকে যাওয়ার গরজটা আদমজির কাছে পরাশর তার নিজের একটা খেয়াল বলে ব্যাখ্যা করেছে। বলেছে, "জায়গাটা ভারী ভাল লাগছে, আর একটা এমনি ধু ধু বালির রাজ্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বলে এখনি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

আর দু'দিন থেকে গেলে আদমজির কোন অসুবিধে হবে কিনা পরাশর জানতে চেয়েছে তারপর। আদমজি কোন অসুবিধে হবে না জানিয়ে পরাশরের খেয়ালই মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু সেই সময় পরাশরের দিকে কেমন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে চাইতেও দেখেছি।

চারদিনের মধ্যে দুটো দিন সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নেই কেটেছে। বালীয়াড়ীর ঢিবির ধারে যে অদ্ভুত ব্যাপার সবাই দেখেছিলাম কোনভাবে তার কোন পুনরাবৃত্তি আর ঘটেনি।

শমিতা এ দুটো দিন নষ্ট হ'তে দেয়নি। পীড়াপীড়ি করে পরাশরকে দিয়ে তার আরম্ভ করা গল্পটা শেষ করিয়েছে।

আরম্ভটা যত রোমাঞ্চকর শেষটা কিন্তু তা নয়। ভয়ঙ্কর গোছের কিছু না হওয়ায় শমিতা তো রীতিমত হতাশই হয়েছে।

ক্ষুব্ধস্বরে বলেছে, "আপনি সত্যি গল্পটা চেপে যাচ্ছেন চাচাজী।"

শমিতার ওরকম সন্দেহ হওয়া অন্যায় নয়।

একেবারে লোমহর্ষণ মুহূর্তে যে গল্প পরাশর থামিয়েছিল তার শেষটা সে ঝিরঝিরে মরা একটা ধারায় বালিতেই প্রায় হারিয়ে যেতে দিয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

পরাশর শেষটা যা বলেছে তার সারমর্ম হল এই,—পরাশর সামান্যর জন্যে লক্ষভ্রষ্ট দুটো তীরের পর অব্যর্থ তৃতীয়টার জন্যে যখন ইষ্টনাম জপ করে অপেক্ষা করছে তখন হঠাৎ যেন ভোজবাজীতে তিনটে ভূতুড়ে মূর্তিকে দূরের বালির ঢেউ তোলা তেপান্তরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে।

প্রথমে এরকম আশ্চর্য পরিত্রাণের কোন কারণই সে খুঁজে পায়নি। এ যেন অলৌকিক কোন ব্যাপার।

অলৌকিক ব্যাপারটার বাস্তব ব্যাখ্যা পেয়েছে মিনিটখানেকের মধ্যেই। দক্ষিণ-পূবের দূর দিগন্তে প্রথম একটুখানি ক্ষীণ ধুলোর কুণ্ডলী যেন উঠছে বলে মনে হয়েছে।

ধুলোর কুণ্ডলীর ধরনটা দেখেই বুঝেছে যে সেটা বালুঝড়ের পূর্বাভাস নয়। বালুঝড় অবশ্য এই তেপান্তরে অজানা তীরন্দাজ দুশমনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার যদি বা ক্ষীণতম আশা থাকে, এ অঞ্চলের বালুঝড়ের কাছে তা নেই। তবে বালুঝড় হলে আকাশের চেহারাই আলাদা হত। আর দিগন্তে শুধু একটা ক্ষীণ ধুলোর কুণ্ডলী দেখা যেত না।

এ কথাগুলো ভেবে নিতে না নিতেই ধুলোর কুণ্ডলীর স্বরূপটা বোঝা গেছে।

ধুলোর কুণ্ডলী উঠছে উট আর ঘোড়ার এক কাফিলা থেকে।

কাফিলাটা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন। দলটা খুব ছোট নয়, আসছেও বেশ দ্রুতগতিতে।

অজানা দুশমনদের চোখ আর কান অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। দূর থেকে এ কাফিলার আসা টের পেয়েই তারা সময় থাকতে সটকান দিয়েছে।

পরাশরের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ কাফিলা বালির রাজ্যের দুশমন ডাকুদের শত্রু হতে পারে, কিন্তু পরাশরেরই যে বন্ধু হবে তার ঠিক কি?

www.pathagar.blogspot.com

নামে ব্রিটিশ শাসনে থাকলেও এ প্রায় অরাজক মগের মুল্লুক। বিশেষ করে বেলুচিস্তানের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত থেকে সিন্ধু হয়ে গুজরাটের এই কচ্ছের মরুভূমি পর্যন্ত লুটেরা দলবদ্ধ ডাকাতদের অবাধ রাজত্ব। তারা এমনি উটের কাফিলায় মরুপ্রান্তরে শিকারের খোঁজে বেড়ায়। সাধারণ মানুষ তো বটেই এসব অঞ্চলের পুলিশও সশস্ত্র ও দলে ভারী না হলে এদের ঘাঁটায় না।

দূরের কাফিলা কিছুটা এগিয়ে আসার মধ্যেই পরাশর এসব ভেবে নিয়েছিল। আত্মগোপন করবার কোন জায়গা কাছাকাছি থাকলে সে সুযোগ পরাশর নিত কিন্তু দৃষ্টিসীমার মধ্যে সেরকম কোন আশ্রয় নেই। তাছাড়া থাকলেও সে-সুযোগ সে নিত কিনা সন্দেহ! দেখতে দেখতে যে কাফিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে তা যদি লুটেরা ডাকুদেরই হয় তাহলেও তাদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে সেই তীরন্দাজ দুশমনদের কবলে সে পড়তে চায় না। ডাকুরা চলে গেলে আবার হানা দেবার জন্যে তারা যে ওৎ পেতে নেই কে বলতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে পরাশর কাফিলার জন্যে অপেক্ষাই করেছে!

কাফিলার প্রথম যে উটের সওয়ার তার কাছে এসে বাহন রুখেছে তার চেহারা দেখে পরাশর একটুও আশ্বস্ত হতে পারেনি। চেহারা, পোশাক বেশ সন্দেহজনক তো বটেই, হাতের গাদা বন্দুকটাও তার পরাশরের দিকে তাক করা।

কড়া কর্কশ স্বরে কি একটা সে ধমক দিয়ে পরাশরের কাছে জানতে চেয়েছে। পরাশর উর্দু, হিন্দী গুজরাটী এমন কি সিন্ধীও একটু-আধটু জানে কিন্তু সে ভাষার একবর্ণও বুঝতে পারেনি।

ভাঙা ভাঙা সিন্ধিতেই পরাশর সে কথা জানিয়েছে। লোকটার চোখমুখের হিংস্র ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছে এক্ষুনি বুঝি সে গুলি

করবে। বন্দুকের ঘোড়াটা সে টেপেনি শুধু তার দুজন সঙ্গী এসে পড়ে পেছন থেকে কি যেন বলায়।

তিনজনের মধ্যে উত্তেজিত গলায় যে সব কথাবার্তা হয়েছে পরাশরের কাছে তা সম্পূর্ণ অবোধ্য।

ইতিমধ্যে কাফিলার আরও অনেকে তখন সেখানে এসে পড়েছে। পরাশরকে ঘিরে কাফিলার উটের সওয়াররা একটা বৃত্ত রচনা করেছে।

তাদেরই মধ্যে একটু সরেস সাজ পরানো সেরা চেহারার একটা উট থেকে যে লোকটি এবার নেমেছে তাকে এ কাফিলার সর্দার গোছের বলেই মনে হয়। চেহারা পোশাক অন্তত সেই রকম। পরাশরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে লোকটা তার অনুচরদের চেয়ে একটু মোলায়েম গলায় যে প্রশ্ন করেছে পরাশর তার উত্তরে ভাঙা ভাঙা সিন্ধিতে সেই আগের কথাই জানিয়েছে। জানিয়েছে যে, কাফিলার লোকেদের ভাষা তার বোধগম্য নয়। সর্দার গোছের লোকটি বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করে এবার তার পাশের একজন অনুচরকে কি যেন হুকুম করেছে।

সে হুকুমের ফলে যা ঘটেছে তাতে পরাশর একেবারে তাজ্জব।

পেছনের একটি উটের হাওদা থেকে অনুচর যাকে পরাশরের সামনে নিয়ে এসেছে সে একটি মেয়ে।

বছর কুড়ি বাইশ বয়স হবে। মুখখানা দামী ওড়নায় প্রায় বোরখার মতই ঢাকা, কিন্তু সালওয়ার কোর্তা পরা তন্বী সুঠাম চেহারাটা তাতেই ভালো করে বোঝা গেছে।

কে এই মেয়েটি?

কাফিলার পুরুষদের দেখে হিন্দু না মুসলমান স্পষ্ট করে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই। দাড়ি গোঁফের বৈচিত্র্য দেখে মিশ্রিত দল বলেই মনে হয়।

কিন্তু ধর্ম যাই হোক এদিকের বিশেষ করে এই সব মরুপাহাড়

অঞ্চলে মেয়েদের আব্রু অত্যন্ত বেশী। বোরখা যাদের পরতে হয় না তাদেরও অনেকটা অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকতে হয়। সুন্দরী যুবতী একটি মেয়ের পক্ষে শুধু ওড়নায় মুখ ঢেকে পরপুরুষের সামনে হাজির হওয়া চলে না।

www.boiRboi.blogspot.com

এসব ভাবনা মাঝপথেই থামাতে হয়।

কাফিলা সর্দারের হুকুমে মেয়েটি যা বলেছে তা শুনে পরাশর বিস্মিত।

বিস্মিত তার বক্তব্য শুনে নয়, তার ভাষা শুনে।

মেয়েটি চোস্ত পরিষ্কার কাথিয়াওয়াড়ীতে পরাশরের পরিচয় জানতে চেয়েছে।

পরাশর অত্যন্ত অবাক হবার দরুনই জবাব দিতে পারেনি। কাফিলা সর্দার তার নীরবতায় ধমক দিয়ে কি যেন বলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ভীতকণ্ঠে পরাশরকে অনুরোধ করেছে, "চুপ করে থাকবেন না। যা হয় কিছু বলুন।"

ঐ, 'যা হোক্ কিছু বলুন' শুনে পরাশরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেছে। সেও ভাঙা গুজরাটীতে বলেছে, "বুঝতে পারছি ওরা আমাদের ভাষার কিছুই জানে না। আমি যদি উত্তর দেবার ছলে কিছু কিছু প্রশ্ন করে যাই আপনি ওদের যা খুশি বলে সামলে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন কি?"

পরাশরের ভাঙা গুজরাটী বুঝতে মেয়েটির কষ্ট হয়নি।

ধরা পড়বার ভয়ে ভীত প্রতিবাদটাতেই ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসার সুর দিয়ে মেয়েটি বলেছে, "ওরকম কাজই করবেন না, দোহাই আপনার! তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনার নিজের পরিচয়টা তাড়াতাড়ি দিন।"

এ কথার পর মেয়েটি সর্দারের দিকে ফিরে তাদের ভাষায় কি একটা বলেছে। উত্তরের জবাব পেতে দেরী হওয়ায় কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিয়েছে বলেই মনে হয়। পরাশর ততক্ষণে তার বক্তব্যটা

তৈরী করে নিয়ে বলেছে, "ওদের বলুন আমি এ অচেনা দেশে সম্পূর্ণ বিদেশী। সরকারের তরফ থেকে এখানে জরীপ করতে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আপনি এ দলে কেমন করে এলেন? দলটাই বা কাদের? সেটা পরের প্রশ্নের সঙ্গে জানান।"

পরাশরের ধারণা ছিল মেয়েটি তার কথায় রাজী হয়ে সহযোগিতা করবে না। কিন্তু পরাশরকে অত্যন্ত সাবধানে তার জবাব সাজাতে অনুরোধ করে মেয়েটি এ চাতুরীতে যোগ দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে পরাশর যা জানিয়েছে ও জেনেছে তা হল এই—এ কাফিলা ঠিক ডাকু লুটেরা দলের না হলেও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত এক সম্প্রদায়ের। সে যুগে বেলুচি হিন্দু মুসলমানে কোন ঝগড়া ছিল না। এরা সবাই বেলুচি। মুসলমানই বেশী হলেও এ দলে জনকয়েক হিন্দু আছে। দলের সর্দার দুজনেই হিন্দু। বেলুচিস্থানের উখাল বলে এক জায়গা থেকে এরা বছরে একবার কাফিলায় সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ হয়ে গুজরাটের রাজকোট পর্যন্ত সদাগরী করতে আসে। সওদা কিনে বেচে মরুভূমির পথে বয়ে নিয়ে যাওয়াই এদের আসল কাজ হলেও সুবিধে থাকলে ছোটখাট অন্য দলকে লুটতরাজ করতে এরা ছাড়ে না।

এবারে রাজকোট থেকে ফেরবার পথে দুই সর্দারে দারুণ ঝগড়া হয়েছে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে। মেয়েটির বাবা উখালেরই আর এক সর্দার। মেয়েটিকে তার মাতুলালয় রাজকোটে তিনি পড়াশোনা ও সহবৎ শিক্ষার জন্যে কিছুদিন রেখেছিলেন। মেয়েটির বাবা হঠাৎ উখালেই মারা যাওয়ায় তাঁর আত্মীর-স্বজনের তরফ থেকে এই দুই সর্দার রাজকোট থেকে মেয়েটিকে উখালায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। সাধু উদ্দেশ্য এদের দুজনের কারুরই ছিল না। মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতিও হয়ত জোর করে আদায় করা হয়েছে। মেয়েটির নাম

রঞ্জা। রঞ্জার বাবা বেঁচে থাকলে এই কাফিলার মারফৎ তাকে আনাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতেন না।

রাজকোট থেকে বেরিয়ে কচ্ছ উপসাগরের বাঁক ঘুরে আধা মরুর ভেতর দিয়ে আসবার পথেই দুই সর্দারের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে।

তুচ্ছ ছুতো করে দুজনে একদিন পরস্পরের সঙ্গে লড়াই বাধিয়েছে। এক সর্দারকে হেরে গিয়ে কজন মাত্র অনুচর নিয়ে পালাতে হয়েছে কচ্ছের 'রান'-এর ভেতর দিয়ে। যে জিতেছে সেই মিত্তল সর্দারই এখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। কি তার আসল মতলব রঞ্জা তা জানে না।

পরাশর নিজের বিষয়ে আগে যেটুকু জানিয়েছে আর তার সামান্য যা যোগ করেছে তা এই—সরকারের তরফ থেকে এ অঞ্চলে জরীপ করতে এসে সে একরকম বালিমাটি কোথায় কোথায় আছে তারই হদিশ নিয়ে যাচ্ছে। হলদে লালচে গোছের সে বালিমাটি খুব দামী। দুরন্ত সর্দারকে কৌতূহলী করবার জন্যে সে বালিমাটির নাম যে মোনাজাইট তাও পরাশর জানিয়েছে।

পরাশর যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। মিত্তল সর্দার প্রথমে সন্দেহ করে বালিমাটি কি করে দামী হয় জানতে চেয়েছে। তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম যে কি বস্তু তা বোঝাবার বৃথা চেষ্টা না করে মোনাজাইট বালিমাটি থেকে সোনা রুপোর চেয়ে দামী একটা জিনিস বার করা যায় বলে পরাশর বুঝিয়েছে।

মিত্তল সর্দার পরাশরকে আর ছাড়েনি। দামী বালিমাটি কোথায় পাওয়া যায় দেখাবার জন্যে নজরবন্দী করে দলে নিয়েছে।

পরাশর আপাতত তীরন্দাজ দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাই চেয়েছিল।

পরাশর এরপর গল্পটা একদম সংক্ষেপ করে দিয়ে আমাদের বলেছে যে, মোনাজাইট দেখাবার নাম করে মিত্তলের বেলুচি

কাফিলাকে কচ্ছের রানের ধু-ধু বেলাভূমির ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে অন্য হেরে-যাওয়া সর্দার হঠাৎ দলবল নিয়ে তাদের কাফিলা আক্রমণ করেছে, আর সেই লড়াই-এর সুযোগে পরাশর নিজে পালিয়ে বেঁচেছে।

শমিতা গল্পের এই সমাপ্তিতে একেবারেই খুশি হয়নি। পরাশর শেষটা চেপে যাচ্ছে শমিতার এই অভিযোগটা আমারও সত্যি বলে মনে হয়েছে। পরাশর অবশ্য কৈফিয়ৎ দিয়েছে যে, যা ঘটেছিল তাই তো তাকে বলতে হবে ; গল্পে উত্তেজনা আনবার জন্যে সে তো মিথ্যে করে শেষটা বানিয়ে বলতে পারে না।

"তুমি যা বলছ তাই ঠিক হয়েছিল?" তর্ক করেছে শমিতা, "তুমি এমন স্বার্থপর যে সুবিধে পেয়ে একাই পালিয়ে গেলে, সেই মেয়েটার কি হল না হল গ্রাহ্য করলে না?"

"গ্রাহ্য করে কি করব," একটু মুখ টিপে হেসে পরাশর বলেছে, "একা আমার পক্ষে রঞ্জাকে উদ্ধার করা তো সম্ভব ছিল না! আর সে বেলুচি মেয়ে আমার হাতে উদ্ধার হতে রাজী হত কিনা তারই বা ঠিক কি?"

"তবু চেষ্টা করে একটু দেখেছিলে?" শমিতা ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করেছে।

"চেষ্টা করব কি করে!" পরাশর চোখেমুখে আশঙ্কা ফুটিয়ে বলেছে, "সেই প্রথম দিনই আমার সঙ্গে কথা বলাবার জন্যে দোভাষী হিসেবে মেয়েটিকে বার করা হয়েছিল। তারপর তার ওড়নার একটু আঁচলও দেখবার সুযোগ পাইনি। আমি যেমন ও কাফিলায় নজরবন্দী, রঞ্জাও তো তেমনি কড়া পাহারায় পর্দানসীন। তার দেখা পাব কোথায়?"

শমিতা খুব হতাশ হয়েছে। বলেছে, "সত্যিই তোমার ঐ রঞ্জার কথা ভেবে কষ্ট হয় চাচাজী। তোমায় সে নিজের দুঃখের কথা অত করে যে বলেছিল সেকি অমনি অমনি। নিশ্চয়ই সে

আশা করেছিল যে তুমি তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কিছু করতে পারবে। তুমি যে অত ভীতু স্বার্থপর তা তো আর সে জানতো না!"

শমিতা এরকম একটা গল্পে 'রোমান্স' না পেয়েই যে হতাশ হয়েছে তা বুঝেছি। তার বয়সের পক্ষে প্রেম-ট্রেম সম্বন্ধে ওরকম ভাবালুতা খুব স্বাভাবিক। তার ক্ষুব্ধ অভিযোগে রাগ করার বদলে খুশি হয়েই পরাশর যেন অপরাধীর ভান করে স্বীকার করেছে, "আমি ভীতু স্বার্থপর ঠিকই, কিন্তু ঐ কাফিলা থেকে রঞ্জাকে সত্যিই যদি উদ্ধার করতে পারতাম তাহলে সে তো শক্ত খোলা থেকে উনুনে পড়তো। ঐ জনমানবহীন বালির তেপান্তরে ঐ রকম সুন্দরী যুবতী একটি মেয়েকে নিয়ে যেতাম কোথায়! মিত্তল সর্দারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হয়তো তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সর্দারের হাতে পড়তাম। তাছাড়া কদিন কাফিলার সঙ্গে থেকে মিত্তল সর্দারকে যা দেখেছি তাতে লোকটা আসলে ভাল বলেই মনে হয়েছে। বয়স অল্প, দেখতেও সুপুরুষ। রঞ্জা যে শেষ পর্যন্ত তাকেই পছন্দ করে বিয়ে করে সুখী হয়নি তা কে বলতে পারে?"

"তুমি থাম!" শমিতা এবারে হেসে ফেলে বলেছে, "নিজের দোষ ঢাকতে খুব কৈফিয়ৎ বানাচ্ছো! আচ্ছা, রঞ্জাকে তো একবারের জন্যেও একটুখানি দেখতে পেয়েছিলে। দেখতে কি রকম বল ত?"

"এই—এই—" পরাশর যেন মনে করবার চেষ্টা করে হঠাৎ বলেছে, "তুমি যদি আর ছ'সাত বছরের বড় হতে তাহলে বলতাম অনেকটা তোমার মত।"

"যত মিথ্যে কথা!" শমিতা রাগের ভান করেও হেসে ফেলেছে। হেসেছি আমিও।

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়তি যে চারদিন আমরা ওখানে রইলাম তার দু'দিন এমনি গল্পগাছা ঘোরাফেরাতেই কেটে গেল।

সেদিনকার সেই অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনার কথা আমরা ইচ্ছে করেই আর একবারও এ দু'দিনে তুলিনি। পরাশরের সেইরকমই নির্দেশ ছিল।

শমিতার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল সেও ব্যাপারটাকে মন থেকে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে সহজ হতে পেরেছে।

এ ধারণাটা যে আমাদের ভুল, শমিতার আয়ি বলে যে বৃদ্ধা পরিচারিকা তার সঙ্গে এসেছে তার কথাতেই দ্বিতীয় দিন রাত্রে টের পেলাম।

রাত তখন খুব বেশী হয়নি। আদমজির নিজের তাঁবুতে শমিতা ও আমরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি।

আদমজির প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বেশ একটু কৌতূহল আছে। কোনারকের স্থাপত্য সম্বন্ধে তিনি খোঁজ নিচ্ছিলেন আর আমি যতটুকু জানি তা তাঁকে বোঝাচ্ছিলাম।

শমিতারও এ বিষয়ে কৌতূহল বেশ আছে দেখলাম। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানারকম প্রশ্ন করছিল।

এক পরাশরই এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। কবিতার কথা হলে সে নিশ্চয় উৎসাহ ভরে যোগ দিত। সে তখন আমাদের প্রসঙ্গে কোন মনোযোগ না দিয়ে তাঁবুর ভেতরকার হ্যাজাক বাতির আলোয় একটা নোটবই-এ কি সব যেন টুকছিল।

হঠাৎ শমিতাকে কেমন একটু শঙ্কিত ভাবে তাঁবুর দরজার পর্দার দিকে তাকাতে দেখলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

মনটা ভেতরে ভেতরে এমন অস্থির হয়ে আছে যে ঐটুকুতেই একটা আতঙ্কের শিহরণ যেন সমস্ত শরীরে ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করলাম।

পরমুহূর্তেই জানা গেল, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। শমিতার আয়ি তাকে ডাকতে এসেছে। তাকে দেখেই শমিতার অসন্তোষ আপত্তি আর আবদারের ঐ প্রকাশ।

শমিতার আয়ি এক হিসেবে ক্ষুদে একটি ডিক্টেটর। শমিতাকে ধাত্রী হিসেবে সেই নাকি পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, আর সে-ই শৈশবে শমিতার মা মারা যাবার পর থেকে তাকে মানুষ করছে।

বুড়ী একটি অদ্ভুত চরিত্র। চেহারা, পোশাক, ভাষা সবকিছু দেখেই সে কোন অঞ্চলের লোক তা বোঝবার উপায় নেই। পোশাকটা না গুজরাটী, না রাজস্থানী, না মারাঠী—সব কিছুর যেন একটা খিচুড়ি। তার ভাষাটাও তাই। কি যে সে হড়বড় করে বলে তা একমাত্র শমিতাই বোধহয় ঠিকমত বোঝে আদমজিরও বুঝতে একটু কষ্ট হয় বোধহয়।

শমিতা আয়ি-কে ধমক ধামক বকুনি যেমন দেয় তেমনি ভালবাসেও যথেষ্ট। ভেতরে ভেতরে একটু ভয়ও যেন করে।

আয়ি তখন এসেছিল শমিতাকে খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শোবার জন্যে ডাকতে। প্রথমে তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেই কথাই সে বোধ হয় জানালে। শমিতার জবাবে অন্তত তাই বুঝলাম।

শমিতা আদমজিকে অনুযোগ করে জানালে, এত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুতে সে যাবে না। সে কি এখনও কচি খুকী আছে?

সত্যিই খেয়ে নিয়ে শুতে যাবার মত রাত তখনও হয়নি। অন্যদিন সাধারণত শমিতা আমাদের সঙ্গেই খেতে বসে আরো পরে শুতে যায়।

আদমজি শমিতার হয়ে সেই কথাই আয়িকে জানিয়ে বললেন যে শমিতা আর খানিক বাদেই তাদের সঙ্গে খেয়ে শুতে যাবে।

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যস্, মনিবের খাতির-টাতির রাখা আর আয়ির পক্ষে সম্ভব হল না।

রণমূর্তিতে তাঁবুর ভেতরে এসে ঢুকে সে ঝড়ের বেগে যা বলে গেল তার মর্মার্থ এই বুঝলাম যে, শমিতাকে সবাই মিলে মারবার ব্যবস্থা করছে এই তার ধারণা। বেটিকে খুব আদর দিয়ে আদমজি তো গল্পের আসরে বসিয়েছেন, মেয়েটা যে গত দু'রাত ধরে ঘুমোচ্ছে না, যদি বা ঘুমোয় চমকে জেগে জেগে উঠছে, সে খবর কেউ রাখে? বড়দের আসরে কি সব আজেবাজে কথা শুনেই শমিতার এসব রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই।···

আয়ি হয়ত আরো কিছু বলত কিন্তু আদমজি তাকে থামিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, "শমিতা ঘুমোতে পারছে না কি রকম? একথা তো আমায় বলনি?"

শমিতাই এবার রেগে উঠে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, "তুমি পাগলী বুড়ীর কথা বিশ্বাস কোর না বাবা। ওর ভীমরতি ধরেছে। ওকে এবার মাসোহারা দিয়ে কোন আশ্রম-টাশ্রমে পাঠিয়ে দাও। আমায় একেবারে জ্বালিয়ে মারছে।"

আদমজি এ রাগের ঝঙ্কার অগ্রাহ্য করে শমিতার কাছে ব্যাকুলভাবে জানতে চাইলেন, "কিন্তু তোর ঘুম হচ্ছে না কেন মা? আমায় তো কিছু বলিস নি।"

"কি বলব বাবা? এক-আধদিন অমন ঘুম ভেঙে যাওয়া কি খুব ভাবনার কিছু? সকলেরই তো যায়।"

শমিতার এ কথায় আদমজি কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। বললেন, "কিন্তু সত্যি ভাবনার কিছু না হলে তোর আয়ি অত অস্থির হত না।"

"আয়ি আর আয়ি!" শমিতা এবার রাগ করার বদলে হেসে ফেলল, "ওর কথার এখনও তুমি দাম দাও! ও তো আমি একবার হাঁচলে চোখে অন্ধকার দেখে। ওকে খুশি করতে আমায় তো দোলনায় শুয়ে ফিডিং বট্‌ল্ খেতে হয়। বেশ তাই যাচ্ছি।"

শেষ কথাটায় একটু রাগের ঝঙ্কার তুলে শমিতা তার আয়ির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আদমজি স্নেহভরে সেদিকে একটু হেসে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "সত্যিই আয়ি শমিতাকে এখনো বড় বেশী শাসন করে। ও যে বড় হয়েছে তা মানতে চায় না। ওকে ছাড়াবারও উপায় নেই। মাসোহারা দিয়ে কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করলে তো ক্ষেপে যাবে।"

একটু থেমে আদমজী আবার উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "শমিতার রাত্রে ঘুম না হওয়াটা কিন্তু ভাল ঠেকছে না। ওর তো এসব গোলমাল কখনো ছিল না। এর মধ্যে আপনাদের ভেতরে ভয়ের গল্প কিছু হয়েছে নাকি? ওকে সেরকম কিছু শুনিয়েছেন?"

"ঐ বয়সের ছেলেমেয়েকে ভয়ের গল্প কি শোনাতে হয়!" পরাশর হেসে বললে, "ওরা নিজের মনেই সব বানিয়ে নেয়।"

পরাশর একরকম সুযোগ পেয়েও সেদিনের বালিয়াড়ীর ঘটনাটা উল্লেখ করল না দেখলাম। পরাশরের এ ব্যাপারটা আদমজিকে না জানাবার সিদ্ধান্তটা সেদিনই আমার ভাল লাগেনি। আজও সত্য কথাটা ওভাবে চাপা দেওয়া আমার ভুল মনে হল।

আদমজি পরাশরের ব্যাখ্যায় খুব আশ্বস্ত হয়ত হলেন না, কিন্তু তখনকার মত প্রসঙ্গটা স্থগিত রেখে আমাদের নিয়ে খেতে গেলেন।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে শোবার সময় পরাশরের কাছে আমার দুর্ভাবনাটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

সমুদ্রের ধারে এখানে শীত বেশ কম তবু রাত্তিরে গায়ে একটা পাতলা কম্বল ঢাকা দিলে আরামই লাগে। তাঁবুর দু'পাশে দুজনের দুটি ক্যাম্প খাট। পরাশর সাধারণত দেখেছি বিছানায় একবার গড়ালেই শয়নে পদ্মনাভ। ঘুমিয়ে পড়বার আগেই তাই সোজাসুজি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে কথাটা তুললাম।

বললাম, "তুমি খুব অন্যায় করছ পরাশর।"

"কি অন্যায় ?" এর মধ্যে পরাশরের কথাগুলো একটু ঘুম-জড়ানো বলে কানে লাগলো।

"বালিয়াড়ীর ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটার কোন মানে খুঁজে পেয়েছ ?" আমি একটু কঠিন স্বরেই জানতে চাইলাম।

"খুঁজে পাবার চেষ্টা করছি।" পরাশর যেন কথাটা এইখানেই চাপা দিতে চাইল।

সে সুযোগ তাকে দিলাম না। বললাম, "চেষ্টা তুমি করতে পার কিন্তু আদমজির কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা একেবারেই ঠিক হচ্ছে না। আজকেই মেয়ের ঘুম না হওয়ায় উনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন, পরে যখন ব্যাপারটা পুরোপুরি জানবেন তখন কি মনে করবেন বল ত ?"

"এই মনে করবেন যে তাঁকে কিছুকাল একটু শান্তিতে থাকতে দিতে চেয়েছি।" পরাশরের কথাগুলো শেষ দিকটায় ঘুম-জড়ানো গলায় প্রায় অস্পষ্টই হয়ে গেল।

দু-একবার তাকে জাগাবার বৃথা চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই কম্বল টেনে নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

ঐসব ভাবনা চিন্তার জন্যে ঘুমটা একটু বোধহয় পাতলাই হয়েছিল। একটা ঝাপ্‌সা গোছের স্বপ্নে যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম।

মনে হচ্ছিল তাঁবুর বদলে ছই ঢাকা একটা গরুর গাড়িতে যেন শুয়ে আছি। যেসব গরুর গাড়িতে পুরী থেকে মালপত্র বোঝাই করে আমরা এসেছি স্বপ্নের গরুর গাড়িটা তার চেয়ে অনেক বড়। তার ছইটা যেন একটা সার্কাসের তাঁবুর মত। সেই তাঁবুর একেবারে মাথায় উঁচু ট্রাপিজের মত একটা দোলনায় পা আটকে বিরাট কি একটা যেন ঝুলছে।

ওপরটা অন্ধকার বলে সেটা জন্তু না মানুষ বুঝতে পারছি না। গরুর গাড়ির ভেতর থেকে ভয়ে বার হবার চেষ্টা করছি কিন্তু ছইটার কোন দরজা পাচ্ছি না।

www.boiRboi.blogspot.com

ঘুমের মধ্যে ভয়ের অস্ফুট একটা চিৎকার করে ফেলেছিলাম বোধ হয়। পরের মুহূর্তেই সজাগ হয়ে দেখলাম পরাশর আমার বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আমায় নাড়া দিচ্ছে। তার এক হাতে একটা পেন্সিল টর্চ যাকে বলে সেই জিনিস।

ক্ষণিকের জন্যে একবার সেটা জ্বেলে আমি জেগে উঠেছি দেখে পরাশর চাপা গলায় বললে, "শি্গির উঠে পুলওভারটা চড়িয়ে নাও। বেরুতে হবে।"

কেন, কি করছি, কিছুই না বুঝে পরাশর যা বললে তাই করলাম। পরাশর তখন তাঁবুর পর্দার দরজাটা খুব সন্তর্পণে খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। আকাশে তারার আলো যেটুকু থাকবার কথা সমুদ্র থেকে একটা গাঢ় কুয়াশা উঠে তা ঢেকে দিয়েছে। দূরের দিকে চাইলে তীরে ঢেউ ভাঙার শব্দের সঙ্গে বালির চড়া আর সমুদ্রের সামান্য একটু রঙের তফাৎ বোঝা যায়। ভেঙে পড়া ঢেউএর ফসফরাস জ্বলে ওঠা ক্ষীণ আভাই তার কারণ।

চোখে কিছু দেখা যায় না। কিন্তু পরাশর একাগ্রভাবে কি যেন শোনবার চেষ্টা করছে মনে হল। ঢেউয়ের গর্জনের ওপর কিছু যে শোনা যাবে তা আমার কিন্তু মনে হল না।

ধারণাটা আমার ভুল। ঢেউএর গর্জন একটানা নয়। মাঝে মাঝে তার বাড়া কমার মধ্যে ছেদও পড়ছে। ঠিক সেইরকম একটা ফাঁকে আমিও একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ শুনতে পেলাম।

শব্দটা ভয়ের কিছু নয় কিন্তু এই রাত্রে এই জনশূন্য ধু-ধু বালির তেপান্তরে সে আওয়াজ একেবারে অস্বাভাবিক।

পরাশর আমার হাতটা ছুঁয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললে, "তুমি এখানে পাহারায় থাক, আমি আসছি।"

"না, না।" আমি চাপা গলায় তীব্র প্রতিবাদ জানালাম, "আমি

তোমার সঙ্গেই যাচ্ছ। ব্যাপারটা কিছুই না বুঝে আমি এখানে কি পাহারায় থাকবো!"

"ব্যাপারটা পরে বোঝাচ্ছি।" পরাশর এবার একটু গম্ভীর আদেশের স্বরেই বললে, "এখান থেকে আর দু'টো তাঁবু অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পাচ্ছ। তা থেকে কেউ বেরোয় কিংবা সেখানে বাইরের কেউ ঢোকে কিনা লক্ষ্য রাখ। আমি আসছি!"

পরাশর আমায় আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই বেরিয়ে গেল।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সামনে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার খানিক আগের নিজের স্বপ্নের মতই আজগুবি লাগছে। যে শব্দটা শুনেছিলাম সেটাও তখন সমুদ্রের গর্জন আর ঝড়ো হাওয়ার শব্দের তলায় মিলিয়ে গেছে। সেটা মনের ভুলই ভাবতে পারতাম কিন্তু পরাশরও যখন সেটা শুনেছে তখন তা একেবারে অলীক অনুভূতি হতে পারে না।

কিন্তু সে শব্দটায় এতটা গুরুত্ব দেবার মত কিছু আছে কি? কোন স্বাভাবিক শব্দও তো হতে পারে। আওয়াজটা অবশ্য জন্তু জানোয়ার বা নিশাচর পাখীর ডাক বলে মনে হয়নি। কেমন একটু অস্বাভাবিক যান্ত্রিক গোছের কাতরানো।

ভাবনাটা ঐখানেই সচকিতভাবে থেমে গেল। অন্ধকারে চোখ যেটুকু সয়ে গেছে তাতেই দূরে আবছা একটা গাঢ় ছায়া আমি যেন নড়তে দেখেছি। শমিতা আর তার আয়ি যে তাঁবুতে থাকে তারই কিছু দূরে গাঢ় ছায়াটাকে স্থির হয়ে যেতে দেখলাম।

তাঁবুর ভেতর থেকে সে ছায়ামূর্তিটা বেরিয়েছে না বাইরে থেকে এসেছে ঠিক লক্ষ্য করিনি। মূর্তিটা একটু নড়ে চড়ে এক জায়গাতেই এখনও স্থির হয়ে আছে। কিছুক্ষণ দূর থেকে লক্ষ্য করবার পর আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

সন্তর্পণে বালির ওপর দিয়ে সেই দিকেই অগ্রসর হলাম, মূর্তিটাকে আর একটু কাছ থেকে দেখবার চেষ্টা।

খুব সন্তর্পণে যাবার দরকার ছিল না। ঝোড়ো দমকা হাওয়ার শব্দে বালির ওপর পায়ের আওয়াজ শোনা যাওয়ার কথা নয়।

আমাদের তাঁবুগুলোর পেছন দিক দিয়ে যাবার সময় কিছু দূরে এ সফরের সঙ্গী লোকজন ও গাড়োয়ানদের আস্তানাটা অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম। একটা বড় তেরপল টাঙানো ছাউনি গোছের তাদের আশ্রয়। অন্ধকার আকাশে সেই ছাউনির মাথাটা আর বিরাট সব ফড়িংএর মত মুখ-থোবড়ানো গরুর গাড়িগুলোই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

শমিতাদের তাঁবুর পেছন দিয়ে মূর্তিটার বেশ কাছাকাছি এবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম।

এত কাছাকাছি আসা সত্ত্বেও মূর্তিটার স্বরূপ স্পষ্ট তখনও বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ভাল করে একটু লক্ষ্য করবার পর কেমন একটু খটকা লাগল।

মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলে তৎক্ষণাৎ মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কে ? কে ওখানে ?"

মূর্তিটা চমকে ফিরে তাকালো।

যা সন্দেহ করেছিলাম তাই, মূর্তিটা আর কেউ নয়, আয়ি। অন্ধকারে ভাল করে বুঝতে না পারলেও ছোটখাট চেহারা আর ঝোড়ো হাওয়ায় ওড়া আয়ির ঘাগরার একটু আভাস পেয়ে এই অনুমানই করেছিলাম।

আবছা অন্ধকারেই আয়িকে বেশ একটু ভীত ত্রস্ত মনে হল।

"এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?" একটু ধমকের সুরেই জিজ্ঞেস করলাম।

ধমক দেওয়াই ভুল। আয়ি তার মনিবের ধমকই গ্রাহ্য করে না। আয়ি ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে উদ্ধত স্বরে তার

www.boiRboi.blogspot.com

দুর্বোধ্য ভাষায় যা জবাব দিলে তার মর্মটা বুঝলাম এই—"কি আবার করছি, দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পাচ্ছ না?"

"শীতের রাতে হাওয়া খেতে তো আর দাঁড়াওনি!" এবার একটু মোলায়েম হাল্কা স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে কি বল ত?"

"কিচ্ছু না।" বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে আমায় পাল্টা কিছু জিগ্যেস করবার আর সুযোগ না দিয়ে আয়ি তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল।

বিমূঢ় বিফল হয়ে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাওয়া ছাড়া তখন আর কিছু করবার নেই। তাই গেলাম।

বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হল না। পরাশর কয়েক মিনিট বাদেই ফিরে এল। তাঁবুর ভেতরে ঢুকতেই তাকে ব্যস্তভাবে আয়ির রহস্যজনক ব্যাপারটার কথা জানালাম!

পরাশর বোধহয় নিজের কোন ভাবনাতেই তন্ময় ছিল। আয়ির ব্যাপারটায় যতটা গুরুত্ব দেবে ভেবেছিলাম তা দিল না।

আচমকা আমার সাড়া পেয়ে আয়ির ভীত ত্রস্ত হয়ে ফিরে দাঁড়ানোর কথাটা আবার পরাশরকে মনে করিয়ে দিলাম।

এবার পরাশরের বোধহয় টনক নড়ল। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "খুব চমকে উঠেছিল বলছ?"

নিজেই তারপর উত্তরটা যুগিয়ে আবার বললে, "তা ভয় পেয়ে চমকে ওঠবারই কথা। হঠাৎ ওরকম সময় পেছন থেকে কারুর আওয়াজ শুনলে সবারই বোধহয় ঐ অবস্থা হয়।"

আয়ির হয়ে তার এ ওকালতির প্রতিবাদ করে বললাম, "কিন্তু এই নিশুতি রাতে তাঁবুর বাইরে এসে তার অমন করে দাঁড়াবার মানেটা কি?"

খানিকক্ষণ পরাশরের কোন জবাব নেই। তারপর তার গম্ভীর ও বেশ একটু চিন্তিত গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ, সেইটেই সবচেয়ে কুট প্রশ্ন।"

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁবুর ভেতর ফিরে আলো অবশ্য আমরা আর জ্বালিনি। অন্ধকারে পরাশরের মুখের ভাবটা দেখতে না পেলেও তার গলার স্বরে বুঝলাম রহস্যটা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে, কোন খেই যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না।

এবারে নিজে সে কেন কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি করে এলে বল ত?"

"কি আর করব। খানিকটা ঘুরে এলাম।" পরাশর যেন প্রসঙ্গটা থামাতে চাইছে মনে হল। তা কিন্তু দিলাম না, বললাম, "ঘুরে তো এলে, কিন্তু যার জন্যে ওরকম ব্যস্ত হয়ে বেরিয়েছিলে সে আওয়াজটা কিসের জানতে পারলে?"

"আওয়াজটা কিসের জানবার জন্যে তো বেরোই নি।" পরাশর ঘুম জড়ানো গলায় বললে, "সেটা যে কি বেরোবার আগেই তো বুঝেছি।"

পরাশর বিছানায় শুয়ে প্রায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ফেলেছে তা তার ঘুমন্ত স্বরেই টের পেলাম।

একটু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আওয়াজটা কিসের?"

পরাশরের মৃদু নাক ডাকার আওয়াজ ছাড়া কোন জবাব পেলাম না।

তার পরদিনই সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা জানা গেল।

শমিতাদের তাঁবুর গায়ে বাইরে একটা গাঢ় লাল ছাপ কে দিয়ে গেছে।

ছাপটা বড় অদ্ভুত। একটা বৃত্তের ভেতর শুধু যেন দুটো আরো ছোট বৃত্ত চোখের মত করে আঁকা। যে রং-এ চিহ্নটা আঁকা হয়েছে সে রংটা আমাদের সফরের লটবহরের মধ্যে অন্তত আনা হয়নি।

রসিকতা করে মজা করতে যদি কেউ ছাপটা মেরে থাকে তাহলে রংটা পেল কোথায়? আর শমিতা আর তার আয়ি বাদে মানুষ

www.boiRboi.blogspot.com

তো আমরা তিনজন—আদমজি, পরাশর ও আমি। আমাদের মধ্যে কারুর এ রকম রসিকতা করবার কথা ভাবা যায় না নিশ্চয়।

বাকী থাকে শুধু গাড়োয়ান আর চাকর বাকরেরা। তাদের পক্ষে এরকম সাহস করা অসম্ভব। তাছাড়া গাড়োয়ানদের নিজেদের মধ্যে যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটা তাঁবুর গায়ে লাল ছাপের চেয়ে আরো রহস্যজনক। ব্যাপারটা ভয় পাইয়ে দেবার মতও বটে।

সকালবেলা উঠে তাঁবুর বাইরের এ লাল ছাপ শমিতাই প্রথম লক্ষ্য করে। লক্ষ্য করবার পর আয়িকেও কিছু না বলে সে ভয়ে বিস্ময়ে ছুটে আসে আমাদের তাঁবুতে।

জেগে উঠে আমি তখন মুখ-টুখ ধোবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। পরাশর তখনও তার বিছানায় ঘুমিয়ে। বাইরে থেকে শমিতা চাপা গলায় বার দুই "চাচাজী" বলে ডেকেছে।

এমন অসময়ে তার ডাক শুনে ত বটেই, তার গলার স্বরেও একটা অস্বাভাবিক কিছুর আভাস পেয়ে পরাশরকে আমি ঠেলে জাগিয়েছি।

আমার ঠেলা আর বাইরে থেকে শমিতার আর আর একবার ডাক শুনে পরাশর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে।

দুজনেই তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়েছি। সেখানে শমিতার মুখ দেখেই পরাশর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেছে, "কি হয়েছে কি শমিতা?"

শমিতা চাপা শঙ্কিত গলায় বলেছে, "যা হয়েছে দেখবে এসো।"

শমিতার পিছু পিছু গিয়ে তাঁবুর বাইরে লাল ছাপ আমরা দেখেছি।

এই লাল ছাপের চেয়ে সাংঘাতিক ও রহস্যজনক ব্যাপারটার কথা তখনই জানা গেছে।

শমিতা আগে না জানলেও তার আয়ির কাছে লাল ছাপের

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যাপারটা তখন আর গোপন নেই। আমরা যখন ছাপটা পরীক্ষা করছি তখন সে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারই ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা প্রথম শোনা গেছে। ভর্ৎসনাটা এ সফরের সঙ্গে যারা এসেছে সেই চাকর-বাকরের বিরুদ্ধে। আয়ির দুর্বোধ্য ভাষা থেকে যা বোঝা গেছে তা এই যে, এত বেলাতেও একটা চাকর-বাকরের দেখা না পেয়ে সে খাপ্পা। আদমজির চোখে পড়বার আগেই এ ছাপ আয়ি তুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু হতভাগাদের একটারও চুলের টিকি দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা যে বেশ অস্বাভাবিক তা আমাদেরও তখন খেয়াল হয়েছে। এতক্ষণে তো তাঁবুতে আমাদের সকালের চা পাবার কথা। কিন্তু কারও কোন পাত্তাই তো নেই। চাকর-বাকর, কুক—এরা সব করছে কি?

তাঁবুর পেছনে একটু এগিয়ে চাকর-বাকর ও গাড়োয়ানদের আস্তানাটা এবার দেখতি গেছি। আশ্চর্য! সেখানে তো সব নিঝঝুম!

রান্নার ছাউনীর তলার উনুনের ধোঁয়া উঠছে না। নড়তে চড়তেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

বেশ একটু অবাক আর ভাবিত হয়ে পরাশর আর আমি দুজনেই এবার ছুটে গেছি অনুচরদের আস্তানার দিকে।

বেশীদূর যেতে হয়নি। আস্তানায় পৌঁছবার খানিকটা আগেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা যে কি তা জানতে পেরেছি।

বড় সামিয়ানাটার তলায় চাকর-বাকর, রাঁধুনী, গাড়োয়ান ইত্যাদি সবাই বেহুঁশ হয়ে তখনও ঘুমোচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

চাকর-বাকরদের ঘুম ভাঙতে একবেলা পার হয়ে গেছে। আদমজির কাছেও ব্যাপারটা আর গোপন রাখা যায়নি। তীক্ষ্ণ জেরায় অনুচরদের কাছ থেকে যা জানা গেছে তাতে এ রহস্যভেদের কোন সুবিধে হয়নি। এইটুকু শুধু বোঝা গেছে যে তাদের খাবারে বা জলে কড়া ঘুমের ওষুধ কেউ মিশিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কে তা দিতে পারে আর দেবেই বা কি করে? পুরী শহর কাছে হলে হাঁড়িতে খাবারের অবশিষ্ট একটু-আধটু যা লেগেছিল তার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়ে ঘুমের ওষুধ হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল জানা যেত। এখান থেকে দুদিনের রাস্তা পেরিয়ে তা করানো আর সম্ভব হবে না।

তবু খাবারের বদলে বড় জলের কলসীর সামান্য একটু তলানি জল পরাশর একটা শিশিতে ভরে নিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে অবশ্য জানা গেছে যে জলটা বহুদূরের এক গাঁ থেকে রোজ আসে। যে অনুচরটি ভারা বয়ে জল নিয়ে আসে সে হলপ করে বলেছে যে দূর গাঁয়ের কূপ থেকে সে অত্যন্ত সাবধানেই অন্য দিনের মত ভাল জল নিয়ে এসেছে, তাতে কোনকিছু মিশে যাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

এইসব ব্যাপার নিয়ে যখন উত্তেজিত খোঁজখবর চলছে তখন আর একটি ঘটনা সকলকে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চাকর-বাকর গাড়োয়ান সকলেই এ পর্যন্ত গত রাত্রের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিল। অন্য কোনদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবসর পায় নি।

হঠাৎ একজন গাড়োয়ান অত্যন্ত ভীত শশব্যস্ত হয়ে এসে

www.boiRboi.blogspot.com

জানিয়েছে যে তার বলদ দুটো আর গাড়ি সে খুঁজে পাচ্ছে না।

গাড়ি আর বলদ কোথায় যেতে পারে আমরা ভেবে পাই নি। বলদ দুটো তো নিজেরাই নিজেদের গাড়িতে জুতে চলে যেতে পারে না। গাড়িটায় কোন গাড়োয়ান তাদের জুতেছে নিশ্চয়ই।

কোন গাড়োয়ানকে কি আস্তানায় পাওয়া যাচ্ছে না? ভাল করে খোঁজ নিয়ে হিসেব করে জানা গেছে যে অনুচর ও গাড়োয়ান দলের একজনও অনুপস্থিত নেই।

"এ ত' একেবারে ভৌতিক ব্যাপার দেখছি!" আদমজি চিন্তিত গম্ভীর স্বরে বলেছেন।

ভৌতিক ব্যাপারটা আরো প্রকট হয়েছে দুপুরের দিকে। হারিয়ে যাওয়া বলদের একটা ফিরে এসেছে আমাদের আস্তানায়। যেদিক দিয়ে তাকে আসতে দেখা গেছে, পুরী যাবার উল্টো দিকের সেই বালুকাবিস্তারে খোঁজ করতে গিয়ে অন্য বলদ ও পরিত্যক্ত গাড়িটাকে পাওয়া গেছে। যেখানে তাদের পাওয়া গেছে, তার ধারে-কাছে কোন জনবসতি নেই। সেখানে গাড়ি নিয়ে গিয়ে আবার বলদগুলো খুলে দেওয়ার মানে কি?

চুরির মতলবে যদি কেউ গাড়ি বলদ নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে অমন জায়গায় তাদের ছেড়ে দেবে কেন?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর মেলে নি।

আদমজি তখন শমিতার তাঁবুর বাইরে অদ্ভুত ছাপটার কথাও জানতে পেরেছেন। শুধু কয়েকদিন আগেকার বালিয়াড়ীর পদচিহ্নের রহস্যটা তাঁকে জানানো হয় নি।

যেটুকু জেনেছেন তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে আদমজী আর এ হানা দেওয়া তেপান্তরে থাকতে রাজী হন নি। পরের দিন ভোরবেলাতেই আমরা পুরীর দিকে রওনা হয়েছি।

www.boiRboi.blogspot.com

পুরী ফিরে যাবার পথে উল্লেখ করবার মত কোন কিছুই ঘটে নি। রাঁধুনী হিসেবে যাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার এক সহকারীর সামান্য একটুখানি বেয়াদবির ব্যাপারকে ঘটনার মর্যাদা দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত নয়। পুরী শহরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছবার পর ভাঁড়ার-বওয়া গাড়িতে রাঁধুনী আর তার সহকারীর মধ্যে তুমুল বচসা শুনেছিলাম। আমাদের গিয়ে তা থামাবারও দরকার হয় নি। আমরা বিচার করতে যাবার আগেই রাঁধুনীর সহকারী রেগে গাড়ি ছেড়ে হেঁটেই চলে এসেছে। সে ছোকরা রাঁধুনীর কিছু টাকাকড়ি কোনারকের আস্তানায় থাকতে সরিয়ে ফেলেছিল বলে পরে অভিযোগ শুনেছি রাঁধুনীর কাছে।

সামান্য ঘটনাটা একটু বেশী করে মনে আছে একটা অত্যন্ত অসাধারণ বিবরণে তখন বাধা পড়েছিল বলে।

বিবরণটা দিচ্ছিলেন আদমজি। আমরা তিনজনে পুরী থেকে এক গাড়িতেই এসেছি। কোনারকের অদ্ভুত ঘটনাটা আদমজিকে যে বেশ অভিভূত করেছে সারা রাস্তায় তাঁর আলাপের ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। গাড়িতে রওনা হবার পরই পরাশরকে তিনি ঘটনাটা অলৌকিক বলে ধরা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

পরাশর তাতে হেসে বলেছিল যুক্তিসঙ্গত সব বাস্তব ব্যাখ্যা যদি হার মানে তখনই কোন কিছুকে অলৌকিক ভাবা যেতে পারে।

"এ ঘটনার কি বাস্তব ব্যাখ্যা থাকতে পারে আপনি মনে করেন?" জিজ্ঞাসা করেছিলেন আদমজি।

"তা, অনেক রকমই তো থাকতে পারে।" একটু যেন ভেবে নিয়ে বলেছিল পরাশর।

"তবু একটা ব্যাখ্যা শুনিই না?" এবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।

"সবচেয়ে স্বাভাবিক যা ব্যাখ্যা তাই।" পরাশর একটু হেসে বলেছিল, "কোন গাড়োয়ান ভোরে উঠে গাড়িটা জুতেছিল কোথাও

www.boiRboi.blogspot.com

যাবার জন্যে। তারপর ধর প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে তার দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বলদ দুটো কোন কারণে নিজেরাই গাড়িটা টেনে নিয়ে গেছে নিজেদের খেয়াল মত।"

আদমজি একটু দুঃখের হাসি হেসে বলেছেন, "এ আপনার যোগ্য ব্যাখ্যা হল না ভর্মাজী। প্রথমত সে রাত্রে সবাই তো কোনরকম ঘুমের ওষুধ খেয়ে বেহুঁশ। ঐ লোকটাই শুধু জেগে ছিল ? তার মানে সেই তো অপরাধী। কিন্তু অতগুলো লোককে বেহুঁশ করে তার লাভটা কি ? আর অত সকালে গাড়ি নিয়ে সে যাচ্ছিলোই বা কোথায় ? চুরিটুরির মতলবে যে নয়, গাড়িটাই তো তার প্রমাণ। গাড়িতে মালপত্র কিছুই ছিল না।"

আমি আদমজিকে পুরোপুরি সমর্থন করে বলেছিলাম, "না পরাশর, তোমার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এখানে খাটে না। সে ব্যাখ্যার সারা গায়েই ছিদ্র।"

"তাহলে অলৌকিক ব্যাখ্যাই মেনে নিতে হবে বলছ ?" পরাশর ঈষৎ বিদ্রূপের খোঁচাটা আমাকেই দিয়েছিল, "কিন্তু অলৌকিকেরও হঠাৎ আমাদের ওপর এত সুনজর কেন ?"

"হাল্কা করে দেখবার ব্যাপার নয় ভর্মাজী।" অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষণ্ণ স্বরে বলেছিলেন আদমজি, "অলৌকিক যাকে বলছি সেই অজানা অভিশাপের বিষ-নজর আপনাদের কারুর নয়, শুধু আমারই ওপর। এ ঘটনায় আরো কিছু সাংঘাতিক যে হতে যাচ্ছে তারই পূর্বাভাস পাচ্ছি।"

"ছি! ছি! এ ধরনের অন্ধ কুসংস্কার আপনার সাজে না আদমজি।" পরাশর ঠাট্টা ছেড়ে এবার আন্তরিক ভাবে বলেছিল, "আপনার জীবনে অভিশাপ কোথায় ?"

"আছে ভর্মাজী, আছে।" তিক্তস্বরে বলেছিলেন আদমজি, "এমনি ওপর থেকে দেখলে এক অল্প বয়সেই বিপত্নীক হওয়া ছাড়া আমার জীবনে কোন দুর্ভাগ্য নেই। কিন্তু এক অজানা অভিশাপ

আমার সেই যৌবন কাল থেকে আমায় অনুসরণ করে ফিরছে কোনদিন হঠাৎ সে আমার সব স্বপ্ন ঝলসে দেবে তার কোন ঠিক নেই।"

www.boiRboi.blogspot.com

"খুব অন্যায়, আদমজি খুব অন্যায়!" এবার বেশ কঠিন হয়েই বলেছিল পরাশর, 'মনের মধ্যে এরকম একটা আজগুবি ভয় আপনি পুষে রেখেছেন তা তো জানতাম না। এরকম অদ্ভুত ধারণা আপনার মনে কোথা থেকে জন্মাল?"

কোথা থেকে এ অদ্ভুত ভয়ের সূত্রপাত আদমজি তারই বিবরণ তখন শুরু করেছিলেন। তারই মধ্যে রাঁধুনীর সাগরেদের ঐ উৎপাত।

বাধা পাওয়ায় বিবরণটা পুরোপুরি শোনা তখন আর হয়ে ওঠেনি। শুরুতে আদমজি শুধু তাঁর প্রথম জীবনের একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। তখন রাজস্থানের বারমার বলে এক জায়গায় তিনি রেলের স্লিপার পাতার একজন সামন্যে কন্ট্রাক্টর। বারমার থেকে পশ্চিমের মীরপুর খাস হয়ে হায়দ্রারাবাদ পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হচ্ছে। এখন যা ভারতবর্ষ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত তারই ওপরকার গাদরা বলে একটি জায়গায় তাঁর কাজ চলছে।

গাদরা তখন একটা অখদ্দে গাঁ পর্যন্ত নয়। সেখানে লোকজনদের মাইনে দেবার জন্যে টাকা আনতে আদমজিকে মাসে একবার করে উটের পিঠে মীরপুর খাস-এ যেতে হতো। মীরপুর খাস থেকে টাকা নিয়ে ফেরবার সময় একবার তাঁর উটের সহিস তাঁকে যেতে বারণ করে। একটা দিন অন্তত তিনি যেন যাওয়া স্থগিত রাখেন এই ছিল তার অনুরোধ। আদমজি তখন জোয়ান তরুণ। কিন্তু ঐ মরুপ্রান্তরে কাজ করতে হয় বলে সঙ্গে বন্দুক রাখেন। বন্দুক চালানোতেও তিনি ওস্তাদ। তিনি সহিসের কথা গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল সহিস বোধহয় পথে লুটেরাদের হাতে পড়বার ভয় করেছে। সে যুগে লুটেরাদের উৎপাত ও অঞ্চলে থাকলেও

www.boiRboi.blogspot.com

পারতপক্ষে সরকারী ডাক বা কোন দলের ওপর হানা দিত না। না দেবার কারণ এই যে—তীর ধনুক বল্লম ছাড়া এক-আধটা বাজে গাদা বন্দুকই তাদের সম্বল থাকতো। সে গাদা বন্দুকের পাল্লা তো সামান্যই, তা ছুঁড়তে গিয়ে ফেটেফুটে শিকারের চেয়ে শিকারী জখম হত বেশী।

আদমজি ডাকাতের ভয় করেন নি, কিন্তু যা তিনি কল্পনা করেন নি সেই বিপদই তাঁর দেখা গেছে। মীরপুর খাস থেকে গাদরা যেতে নারা বলে একটা নেহাৎ শুকনো বালিনদী পথে পড়ে। সমুদ্রে নয়—এ নদীটা কচ্ছের রানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই নদী পেরিয়ে গাদরার দিকে অর্ধেক পথ যাবার পর তিনি হঠাৎ সভয়ে লক্ষ্য করেছেন যে এক বিন্দু খাবার জল তাঁর সঙ্গে নেই। খাবার জলের যে মশকটা উটের পেছনে বাঁধা ছিল সেটা কেমন করে ফুটো হয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে গেছে। গোঁয়ার্তুমি করে তিনি দুপুর বেলা কোথাও বিশ্রামের জন্যে আশ্রয় না নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ভরা দুপুরে তখন যেখানে এসে পৌঁছেছেন সেখান থেকে জল না পেলে গাদরা বা নারা নদী কোন জায়গাতেই পৌঁছানো অসম্ভব। মাঝপথেই তেষ্টায় উটটা না হলেও তিনি মারা যাবেন।

কোন আশা নেই জেনেও আদমজি গাদরার দিকেই তাঁর উট চালিয়েছেন। উটটা যেন তার পশুর বুদ্ধিতে মনিবের বিপদ বুঝে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করেছে, কিন্তু তাতে কি লাভ? ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যেই আদমজির এমন অবস্থা হয়েছে যে উটের ওপর আর বুঝি বসে থাকতেই পারবেন না। তখন অবশ্য সূর্য ডুবে আসছে, আর কিছুক্ষণ বাদে রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির অসহ্য উত্তাপ কমে গিয়ে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করবে, কিন্তু জলের অভাব তো তাতে মিটবে না।

এই বালুশয্যাই শেষ শয্যা হবে জেনে আদমজি একটা ছোট বালিয়াড়ীর পাশে উট থেকে নেমেছেন। সেখানে নেমেই তিনি

www.boiRboi.blogspot.com

বুঝেছেন যে সারাদিনের তৃষ্ণা সহ্য করার পর রাতটা বিনা জলে কাটাতে হলে আগামী কাল আর তাঁকে আর উঠতে হবে না। সেইখানে বালির ওপর তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। জায়গাটা সাধারণ উটের কাফিলার পথেও পড়ে না। সুতরাং কতদিন তাঁর শবদেহ যে মরুভূমির রোদে শুকোবে তা বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত কঙ্কালগুলোই হয়ত পড়ে থাকবে।

আদমজি সেই বয়সেই উদ্দাম বেপরোয়া হলেও মনেপ্রাণে হিন্দু। তাঁর মৃতদেহের অন্তত একটা গতি হয় তা চেয়েছিলেন। বালিয়াড়ীর ধারে নেমে টাকাকড়ির থলের সঙ্গে তাঁর নোট বইটায় নিজের নাম-ধাম সব পরিচয় লিখে সেই সঙ্গে এই অনুরোধও জানান যে তাঁর শব যদি কেউ খুঁজে পায় তাহলে এই বালির স্তূপের ধারে পোঁতা অর্থের বিনিময়ে সে যেন তাঁর এক টুকরো অস্থি ঠিকানায় লেখা তাঁর আপনজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়—যাতে আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর শেষকৃত্য করতে পারে।

টাকার থলে ও নোট বই বালির ঢিবির ধারে গর্ত করে পুঁতে রেখে আদমজি ধীরে ধীরে আসন্ন মৃত্যুর আচ্ছন্নতাতেই বোধ হয় তলিয়ে যান।

হঠাৎ একসময় তিনি যেন স্বপ্ন দেখেন যে মশালের আলোয় কারা যেন তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইটুকু টের পাবার পরই তাঁর চেতনা আবার সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়।

সেই হতভাগা রাঁধুনীর সাগরেদকে নিয়ে গোলমালটা হওয়ার দরুন আদমজির বিবরণটা এই মোক্ষম জায়গায় এসে থেমে যায়। তখন পুরী পৌঁছতে আর দেরী নেই। কাহিনীটা তাই এর বেশী আর এগোয় নি।

বি. এন. আর. হোটেলে ফিরে যাবার পর পরাশরকে দুদিন মাত্র থেকে জরুরী কাজে কলকাতা চলে যেতে হয়। আমারও

তার সঙ্গেই যাবার কথা, কিন্তু প্রথমতঃ নিজের কৌতূহলে, দ্বিতীয়তঃ ওখানকার একটি বার্তাজীবী সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি কয়েক দিনের জন্যে হোটেলেই থেকে যাই। থেকে যাবার কারণ হিসেবে রহস্য মীমাংসার আগ্রহটাই আসল। বার্তাজীবী সম্মেলনে যোগ দেওয়াটা ছুতো মাত্র। পরাশর কিন্তু এ বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক নির্বিকার দেখলাম। তার কলকাতা যাওয়ায় বাধা দেবার চেষ্টা আমি করেছিলাম। বলেছিলাম, "এরকম একটা রহস্যের কিনারা না করে তুমি যাচ্ছ কি করে? তোমার ঘুম হবে সেখানে?"

পরাশর তার উত্তরে হেসে বলেছিল, "পৃথিবীতে সব রহস্যের কি কিনারা হয়? সে সব নিয়ে মিছে মাথা গরম করলে তো সারা জীবনের ঘুমই বাতিল করে দিতে হয়।"

"এ রহস্যের কিনারা হবার নয় বলে তুমি মনে করেছ?" একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছি।

"তা তো বলিনি।" পরাশর হেসে বলেছিল, "কিন্তু মীমাংসাও যথাসময়ে ছাড়া হয় না।"

"তার মানে মীমাংসার এখনও দেরী আছে বুঝে ফাঁকটায় তুমি ঘুরে আসছ!" এবারে কৌতুকের স্বরে বলেছিলাম।

"তা ভাবতে পার।" পরাশরও হেসে বলেছিল, "তবে এ রহস্যটা নিয়ে সত্যিই আমি মাথা ঘামাচ্ছি না"

"বল কি! আমি সত্যিই অবাক হয়ে বলেছিলাম, "এটা তুমি গুরুতর কিছু বলে মনে কর না?"

"করি।" পরাশর বলেছিল, "কিন্তু এটার মীমাংসার ভার তোমার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমার ওপর!" মনে মনে খুশি হলেও মুখে আমি একটু অনিচ্ছা দেখিয়েছিলাম।

"কেন, পারবে না তুমি?"

পরাশরের গলার স্বরে সন্দেহ থাক বা না থাক তার কথায়

আমার না পারবার ইঙ্গিতটুকুতেই তখন মেজাজ চড়ে গিয়েছে। একটু তাচ্ছিল্যভরেই বলেছিলাম, "না পারবার কি আছে?"

নিজের আগ্রহ তো ছিলই তার ওপর পরাশরের শেষ কথাটা আমার মনে লেগেছিল। মনে মনে তখনই সঙ্কল্প করেছিলাম যে এ রহস্যের একটা মীমাংসা না করে পুরী থেকে নড়ব না।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ একটু প্ল্যান করে নিয়েই ব্যাপারটায় আমি অগ্রসর হয়েছি।

প্রথমেই আদমজি পরিবারের মোটামুটি ইতিহাস আর শমিতার মনে প্রথম আতঙ্ক সঞ্চার কোথায় কেমন করে হয় তা জানা আমার প্রয়োজন বলে মনে হয়। আদমজি বা শমিতার কাছে যতটা সম্ভব জানবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাপ মেয়ে দুজনেই তখন বেশ বিচলিত। জেরার মত করে তাদের কাছে সব খুঁটিয়ে জানা একটু অশোভনই মনে হয়েছে।

এ বিষয়ে সাহায্য পেয়ে গেছি নেহাত অপ্রত্যাশিতভাবে।

এবার কোনারক থেকে ফেরবার পর বি. এন. আর. হোটেলে একটি তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ছেলেটি কোন্ প্রদেশের ঠিক বুঝতে পারিনি। পদবীটা কাজারিয়া হলেও নামটা বাঙালীর মতই—নির্মল। কোনারক থেকে ফেরবার পরই নির্মলকে হোটেলে দেখলাম। হাসিখুশি বেশ মিশুক ফুর্তিবাজ ছেলে। প্রথম দেখাতেই চোখে পড়তে বাধ্য।

নির্মল কাজারিয়াও বোম্বাইএর অধিবাসী। কি সে করে তা গোড়ায় জানতে পারিনি, তবে চালচলন দেখে দস্তুরমত পয়সাওলা খানদানী পরিবারের বলেই মনে হয়েছিল।

আমার সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েই পরিচয়। সমুদ্রে স্নান সেরে সেদিন ফিরে আসছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমাকেই ডাকছে বলে মনে হল। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে আমার দিকেই আসছে। আমার কাছে এসে একটা স্নান করবার চোখ ঢাকা গগলস

হাতে করে এগিয়ে দিয়ে বললে, "এটা আপনি ফেলে আসছিলেন।"

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা নেড়ে হেসে বলতে হল যে সে গগলস্ আমার নয়। আমি স্নান করতে কোন গগলস্-ই ব্যবহার করি না। ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "দুঃখিত। যেখানে আপনার তোয়ালে, জামা ছিল তারই কাছে পড়েছিল বলে ভাবলাম এটা বুঝি আপনি ফেলে গেছেন। আচ্ছা বিরক্ত করবার জন্যে মাপ করবেন।"

হেসে বললাম, "বিলক্ষণ, এতে মাপ করবার কি আছে? আপনি তো পিছু ডেকে আমার ট্রেন ফেল করিয়ে দেননি।"

"না তা দিইনি।" ছেলেটি এ রসিকতায় হেসেই খুন। হাসি থামিয়ে আমার সঙ্গে যেতে যেতে বললে, "আপনি বাঙালী নিচ্চয়?"

শেষ প্রশ্নটা সে বাংলাতেই বলেছিল। তাকে সংশোধন করে বললাম, "নিচ্চয় নয়, কথাটা নিশ্চয়। বাংলা শিখলেন কোথায়?"

"শিখেছি আর কোথায়?" ছেলেটি হেসে বললে, "দু-একটা কথা শিখেছি, তাও তো ঐরকম ভুল বলি।"

এমনি করেই নির্মলের সঙ্গে আলাপ। প্রথম থেকেই তাকে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু আদমজি আর শমিতার দেখলাম প্রতিক্রিয়াটা একেবারে উল্টো।

প্রথম আলাপের দিনই নির্মলের সঙ্গে হোটেলে ঢোকবার পথে আদমজি ও শমিতার সঙ্গে দেখা। আদমজি তাঁর ও তাঁর মেয়ের জন্যে হোটেলের লাগাও একটি কটেজ নিয়েছেন। আদমজির নিজের তো নেই, শমিতারও সমুদ্রস্নানে খুব বেশী উৎসাহ দেখি না।

কটেজের বাইরে ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আদমজি তখন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। শমিতা দাঁড়িয়েছিল তাঁর চেয়ারের পেছনে।

আমাদের ঢুকতে দেখে আদমজি মুখ তুলে তাকালেন। শমিতাও।

www.boiRboi.blogspot.com

নির্মল কাজারিয়া তাঁদের হাত তুলে যেভাবে নমস্কার জানাল তাতে বুঝলাম সে তাঁদের অচেনা নয়।

আদমজি কিন্তু নেহাৎ ভ্রূকুটিভরে মাথাটা একটু নেড়ে নির্মলের নমস্কারটা স্বীকার করলেন মাত্র। শমিতা সেটুকুও না করে কটেজের ভেতরে চলে গেল।

আদমজি তখন খবরের কাগজের ওপর মুখ নামিয়েছেন।

নির্মলের সঙ্গে তাই আমি ভেতরে আমাদের যে যার ঘরেই চলে গেলাম।

আমাদের দুজনেরই কামরা দোতলায়। আদমজির তার প্রতি ওরকম বিরূপতার কারণটা জানতে ইচ্ছে করলেও ভদ্রতায় বাধছিল।

নির্মলই কৌতূহলটা মিটিয়ে দিল।

ওপরের ল্যাণ্ডিং-এর ডানদিকের ল্যাণ্ডিং দিয়ে আমার কামরায় যেতে হয় আর বাঁদিক দিয়ে নির্মলের। ল্যাণ্ডিংএ উঠে সাধারণ একটু সৌজন্য সম্ভাষণ জানিয়ে নিজের কামরার দিকে যেতে যাচ্ছি হঠাৎ নির্মল একটু হেসে বললে, "ব্যাপারটা আপনার একটু অদ্ভুত লাগল নিশ্চয় ?"

না বোঝবার ভান করে, কোন্ ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। কিন্তু এই সহজ সরল প্রাণখোলা ছেলেটির সঙ্গে সেটুকু মিথ্যাচার করতে ইচ্ছে হল না। সোজাসুজি স্বীকার করলাম, "তা একটু লাগল।"

"যদি একটু অনুমতি করেন," নির্মল বললে, "তাহলে মিনিট দশেক বাদে আপনার ঘরে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে চাই।"

"অনুমতি আবার কি !" আন্তরিক ভাবেই বললাম, "ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। এলে খুশিই হব।"

মিনিট দশেকের মধ্যেই নির্মল আমার কামরায় এল। পরনে একটা পাজামা আর গুজরাটী কলার দেওয়া পাঞ্জাবিতে তাকে সত্যিই বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

হেসে বললাম, কিছু মনে করবেন না। এরকম হ্যাণ্ডসায় আপনার চেহারা, বোম্বাইতেও থাকেন, আপনি কি ফিল্ম হীরো-টিরো নাকি ?"

"ফিল্ম হীরো।" নির্মল যেন অপমানিত বোধ করল। তারপর হেসে ফেলে বললে, "তা ফিল্ম হীরো হলে মন্দ হত না। আদমজি তাহলে অত খাপ্পা হতেন না আমার ওপর।"

কামরার সামনের দিকে সোফা-সেটি সাজানো বেশ ভালো বসবার বন্দোবস্ত। পেছনে একটা বাহারে স্ক্রীনের ওধারে শোবার ব্যবস্থা।

নির্মলকে সোফায় বসতে বলে অ্যাটেণ্ডেণ্ট-এর বেলটা টিপতে যাচ্ছিলাম চা আনাবার জন্যে।

নির্মল যেন আমার মনের কথাটা অনুমান করে বললে, "চা আনতে চাইছেন কি ? আপনাকে আনতে হবে না। আমি নিজের কামরা থেকেই অর্ডার দিয়ে এসেছি এখানে দিয়ে যাবার জন্যে।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "এবারে আপনার কথাটা শুনি। ফিল্ম হীরো হলে যিনি আপনাকে মেনে নিতেন ভাবছেন, সেই আদমজি আপনার ওপর অমন অপ্রসন্ন কেন ?"

"অপ্রসন্ন আমার ওপরে নয়, আসলে আমার বাবার ওপর।" নির্মল কৌতুক ভরা মুখে বললে, "উত্তরাধিকার সূত্রে ওটা আমার ওপর অসেছে।"

"কি রকম ?" কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আদমজির কোম্পানীর নাম আপনি জানেন কিনা জানি না।" নির্মল এবার বুঝিয়ে বললে, "কোম্পানীর নাম হল মুখরাম মঙ্গলদাস সিণ্ডিকেট। পদবীর বদলে দুজন অংশীদারের প্রথম নাম দিয়ে এ নামকরণ। প্রথম নাম মুখরাম হচ্ছে, আমার বাবা। বাবার মৃত্যুর আগে দুই বন্ধুর কোন এক কারণে বিশেষ মনোমালিন্য হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

মনোমালিন্যের চেয়ে তা আরো বেশ তিক্ত কিছু। দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। পার্টনারশিপ তখনই ভেঙে দেওয়ার কথা হয়েছিল, আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ, বাবা সেই সময় হঠাৎ মারা যান। বাবার ওয়ারিশ হিসেবে আমি কোম্পানীর অংশীদার হয়েছি। আদমজি বাবার সঙ্গে যা ব্যবস্থা হয়েছিল সেইমত পার্টনারশিপ ভেঙে দিয়ে এখন সম্পূর্ণ আলাদা হতে চান। আমি তাতে রাজী হচ্ছি না।"

শেষ কথাটা বলবার সময় নির্মলের মুখে একটু বেশ দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ্য করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজী হচ্ছেন না কেন? আদমজি উচিত মত ভাগ দিচ্ছেন না বলে?"

"না তা নয়।" নির্মলের মুখে সেই একটু বাঁকা কৌতুকের হাসি। "আদমজি ন্যায্যের চেয়ে বরং বেশীই দিচ্ছেন।"

"তাহলে?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"ধরুন এটা আমার অন্যায় জেদ। লাখ টাকার লোভে শুধু আদমজির হুকুমে এমন লাভের ব্যবসার অংশ আমি বেচব কেন?"—নির্মল মুখটা একটু গম্ভীর করবার চেষ্টা করলে।

তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। মাথা নেড়ে বললাম, "না, তা নয়, আসল কারণটা বলুন।"

"আসল কারণটা শুনতে চান?" এবার নির্মলের মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি যেন ফুটে উঠল, "এ পার্টনারশিপ ভাঙা আমি অন্যায় বলে মনে করি। দুই বন্ধুতে ঝগড়া হয়ে তখনকার মত এইটেই স্থির হয়েছিল বটে, কিন্তু বাবা বেঁচে থাকলে এ ঝগড়া আবার মিটে যেত আমি জানি। বাবার কথা ভেবেই ব্যবসার এ সম্পর্কটা আমি ঘুচিয়ে দিতে চাই না। আদমজির কিন্তু ধারণা, আমি শুধু তাঁকে জব্দ করবার জন্যে এরকম জেদ করছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার বাবার সঙ্গে আদমজির কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কিছু জানেন?"

এক মুহূর্ত যেন একটু দ্বিধা করে নির্মল বললে, "না জানি না।"

তার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না।

এ প্রশ্নটা যেন চাপা দেবার জন্যেই নির্মল তাড়াতাড়ি একটু দুঃখের হাসি হেসে আবার বললে, "ঝগড়ার কারণটা যাই হোক, সেটা এমন কিছু ভয়ানক নিশ্চয়ই নয় যাতে বাপের শাস্তি ছেলেকেও দিতে হয়। আমি যত আত্মীয় হবারই চেষ্টা করি না কেন, আদমজি পরিবারের আমি চক্ষুশূল।"

নির্মলের কথাটা যে কি নিষ্ঠুরভাবে সত্য পরের মুহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম।

বসবার সোফা-সেটিতে আমি বারান্দার দিকে মুখ করে বসেছিলাম আর নির্মল ভেতরের দিকে। হঠাৎ শমিতাকে বারান্দা দিয়ে আসতে দেখলাম। আসছিল আমার কামরাতেই। কিন্তু দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে, "বাবা আপনাকে একবার—" এইটুকু বলার পরই নির্মলকে ফিরতে দেখে ভ্রূকুটি করে বিরক্তমুখে, "আচ্ছা পরে আসছি"—বলে সে অমনভাবে বেরিয়ে চলে যাবে ভাবতে পারিনি।

নির্মল তখন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে, "আমি এখন তাহলে আসি।"

বলেই সে আর দাঁড়ালো না, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

এই নির্মলের কাছেই আদমজির আদি ইতিহাস দু' একদিনের মধ্যে জানতে পারি। আদমজি ঠিক কোথাকার লোক কেউ জানে না। নির্মলের বাবা হয়তো জানতেন কিন্তু নির্মল তাঁর কাছে কিছু শোনেনি। নির্মলের বাবা মুখরাম কাজারিয়ার সঙ্গে আদমজির পরিচয় বহুকাল আগে এখন যা পশ্চিম পাকিস্তান—সেইখানে। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বোম্বাই এসে ব্যবসা শুরু করেন। আদমজির একটা ব্যাপার কিন্তু নির্মল ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছে। তিনি যেন তখন থেকেই সব সময়ে কোন একটা কিছুর আতঙ্কে থাকতেন।

নির্মল তখন ছেলেমানুষ, তবু সে মাঝে মাঝে তার বাবার সঙ্গে আদমজির কথাবার্তা শুনেছে। মুখরাম কাজারিয়া আদমজিকে প্রায়ই বলতেন, "তুমি শেষকালে গাঁইয়া মুখ্য মেয়েদের মত সারাক্ষণ ভূতের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে?"

আদমজি কাঁটা হয়ে না থাকুন তখনকার দিনে সবসময়েই কেমন একটা অস্থির উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন তা নির্মলের মনে আছে। শমিতার মার অসুস্থতাও তার একটা কারণ হতে পারে। শমিতার মা অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। নির্মল এখন পরিণত বয়সে তাঁর চেহারার কথা স্মরণ করে তা বুঝতে পারে। তখন তাঁকে বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই দিনরাত দেখেছে। কিছু একটা শক্ত অসুখে তিনি ভুগছিলেন। শমিতার মা সেই সময়েই মারা যান। শমিতা তখন খুব ছোট। নির্মলের নিজের মা'ও আগে মারা গিয়েছিলেন সুতরাং মুখরাম কাজারিয়া আর মঙ্গলদাস আদমজি দুই বন্ধুই তখন বিপত্নীক হয়ে ছেলেমেয়েদের চিন্তাই সার

www.boiRboi.blogspot.com

করেছেন। শমিতাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে তার আয়ি। এই আয়ি যে কবে থেকে শমিতাদের সংসারে আছে শমিতা নিজেই বোধ হয় জানে না। নির্মলের ধারণা আয়ি শমিতার মায়ের বাপের বাড়ির লোক। সেদিক দিয়ে ধরলে আয়িকে ভারতের বাইরের কোন জায়গার বলে সন্দেহ হয়। ইরাণী, আফগান কি বেলুচি হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আদমজির পরিবারে তার প্রতিপত্তি কিন্তু বেশ একটু রহস্যজনক।

নির্মলের কাছে এসব জানবার পর সেইদিনই আদমজির সঙ্গে দেখা করে আমি সেই কোনারক থেকে আসার পথে বলা গল্পটার শেষ জানতে চাই।

আদমজি যা বলেছিলেন তা তাঁকে আমি মনে করিয়ে দিয়েছি।

তিনি গল্পটা আরম্ভ করেছিলেন, কোন অশুভ অভিশাপ তাঁকে অনুসরণ করে ফিরছে এইটেরই প্রমাণ দেওয়ার জন্যে।

জিজ্ঞেস করেছি যে—জলের জায়গা ফুটো হয়ে মরুভূমির মাঝখানে তৃষ্ণায় মরতে বসাই কি সেই অভিশাপ তিনি বলতে চান?

আদমজি সজোরে মাথা নেড়েছেন, তারপর বলেছেন, "না। মরে গেলে তো সব লেঠা চুকেই যেত, অভিশাপটা অন্য কিছুর। বালিয়াড়ীর ধারে তৃষ্ণায় মরমর হয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ জ্ঞান হওয়ার পর সন্দেহ হয়েছে যে আমি ইহলোক ছেড়ে মৃত্যুর পারেই চলে এসেছি। চারিধারে যে সব লোকজন, যে পরিবেশ দেখেছি সব আমার অচেনা। যেখানে জ্ঞান হয়েছিল সেটাও একটা তাঁবুর অংশ। লোকজন যা ঘুরছে ফিরছে তাদের কেমন চোয়াড়ে নিষ্ঠুর বলেই মনে হয়।

এদের মাঝখানে আমি কেমন করে এলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

শমিতার যে আয়ি দেখছেন তাকে সেই তাঁবুতেই প্রথম দেখি। আমার তখন বাঁচবার আশা ছিল না। আয়ি আমাকে আশ্চর্যরকম শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে।

সুস্থ হবার পর জানতে পারি যে আমি যাদের সঙ্গে আছি তারা একটা আধা-ডাকাত, আধা-সদাগরের কাফিলা।

কিছুদিন বাদে তাদের কাছ থেকে মুক্তি পাই। মুক্তি পাওয়ার পর আমার সেই বালিয়াড়ীর ধারে পোঁতা নোটবই আর টাকাগুলোর খোঁজ করি।

আশ্চর্যের কথা এই যে সে বালিয়াড়ী তন্ন তন্ন করে, ঐ অঞ্চল চষে ফেলেও, আমি তা খুঁজে পাই না।

মরুভূমির ঝড়ে বালির ঢিবির যে অদল-বদল হয় তখনও জানতাম না।

কাগজপত্র ও টাকাকড়ি না পাওয়ায় গাদরা ফিরে গিয়ে আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত হই।

জলের মশকটা রওনা হবার আগে একটু পরীক্ষা করে নিলে এ শাস্তি আমার হয় না। এইজন্যেই বলছি একটা নির্মম অভিশাপ আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।"

আদমজির গল্পের সমাপ্তিটা একেবারে বানানো ও জোলো লেগেছে আমার। অনেকগুলো জায়গায় যে সত্য কথা তিনি চেপে গিয়েছেন তা তাঁর বর্ণনার বড় বড় ফাঁক থেকেই বোঝা গেছে। মশক ফুটো হয়ে জলের অভাবে তেষ্টায় মরতে বসা আর তারপর কোন ডাকাত দলে আশ্রয় পেয়ে সুস্থ হয়ে ছাড়া পাবার পর নিজের লুকোনো কাগজপত্র ও টাকা খুঁজে না পাওয়ায় চাকরি খোয়ানোটা এমন একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপ বলে কিছুতেই মানতে পারলাম না।

তাছাড়া নির্মলের কাছে যা জেনেছি তাতে আরো কয়েকটা প্রশ্নের খোঁচা তাঁর বিবরণে থেকে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

নির্মল বলেছে, আয়ি আদমজির বাড়িতে বহুকাল থেকে আছে। শমিতাকে সে মানুষ করেছে। শমিতার মার সঙ্গেই সম্ভবতঃ তাঁর বাপের বাড়ির দেশ থেকে এসেছে। শমিতার মায়ের বাপের বাড়ি থেকে আসার কথাটা নির্মলের ভুল অনুমান হতে পারে, কিন্তু আয়িকে যে ছেলেবেলা থেকে নির্মল আদমজির বাড়িতে দেখেছে এ বিষয়ে তো কোন ভুল নেই। আর আদমজি নিজেই স্বীকার করেছেন যে সেই আধা-ডাকু আধা-সদাগরের কাফিলাতেই আয়িকে প্রথম তিনি দেখেন। সে তাঁকে শুশ্রূষা করে সরিয়ে তোলে তাও তিনি বলেছেন।

সেই ডাকু সদাগরদের দলের আয়ি তাঁর সংসারে এল কি করে? তিনি কি শুধু আয়িকে নিয়েই সেই দল থেকে চলে এসেছিলেন?

কথাগুলো যেন বড্ড এলোমেলো। কোনটার সঙ্গে কোনটা মেলে না।

তখনকার মত এসব কথা কিন্তু আদমজির কাছে তুলিনি। তাঁর বিবরণই যেন মেনে নিয়ে নিজের কামরায় ফেরবার পথে শমিতাকে দেখে তাকে একটু আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে বলেছি।

শমিতা তৎক্ষণাৎ সানন্দে রাজী হয়েছে।

বি. এন. আর. হোটেল থেকে সমুদ্র তখন আজকালকার মত এতখানি সরে যায়নি। এদিকের সমুদ্রতীরটাও ফাঁকা ছিল।

সমুদ্রের কাছাকাছি যাবার পর শমিতার ছেলেমানুষী আর চাপা থাকেনি।

জুতোজোড়া শুকনো বালির ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে ফেনাতোলা ঢেউএর সঙ্গে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

সমুদ্রের ঢেউ নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মসৃণ বালির ওপর দিয়ে ছুটে যায় আবার নতুন ঢেউ তাড়া করে আসার

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হাসতে হাসতে ওপরে ছুটে আসে।

দু'একবার এরকম করবার পর মনে হল ঢেউগুলো যেন তার সঙ্গে তাড়া দিয়ে আবার পালাবার দুষ্টুমির খেলায় মেতেছে।

একবার একটা তেজী ঢেউ ঝাঁপিয়ে এসে বেকায়দায় তাকে ধরেই ফেলল।

তীরের ওপর পড়ে গিয়ে কাপড় জামা ভিজে বালিতে মাখামাখি হয়ে একাকার।

নেমে যাওয়া ঢেউএর টানে তো গড়িয়েই চলে যাচ্ছিল জলের দিকে। তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে কোন রকমে তাকে ধরে রেখেছি।

ভিজে কাপড় জামা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পোশাকের, চুলের, গায়ের বালি যথাসাধ্য ঝেড়ে ফেলবার পর শমিতা নতুন খেলা ধরেছে। বালির ভেতর থেকে ঝিনুক কুড়নো।

তাতে এমন মেতে উঠেছে যে তাকে যেজন্যে ডেকে এনেছি সেকথা পাড়তেই পারিনি।

সুযোগটা এসে গেছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

শমিতার ঝিনুক কুড়নোই স্নেহভরে তন্ময় হয়ে দেখার দরুন অন্য কোন দিকে নজর ছিল না।

হঠাৎ শমিতাকে কেমন যেন শক্ত হয়ে গিয়ে বিরক্তির ভ্রূকুটি করতে দেখে ব্যাপারটা কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি।

আমাদের উল্টো দিক দিয়ে নির্মলই সমুদ্রতীর দিয়ে আসছে।

শমিতা ও আমাকে দেখে সে বেচারা দূর থেকেই বেশ একটু ব্যবধান বাড়িয়ে ওপরের দিকে সরে গিয়ে আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে।

মুখে একটু হয়তো তার কৌতুকের হাসি, কিন্তু যে লোক

www.boiRboi.blogspot.com

দূর থেকে দেখেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে অতখানি সরে যায় তার ওপর অমন ভ্রূকুটি করার কোন মানে হয় না।

সুযোগ পেয়ে শমিতাকে সেই কথাই জিগ্যেস করেছি এবার, "নির্মল ছেলেটি কি অচ্ছুৎ না কোন সাংঘাতিক রোগ আছে ওর? ওকে দেখলেই তোমরা বাপবেটী অমন খাপ্পা হও কেন?"

শমিতা ঠোঁট উল্টে গলায় রাগের ঝাঁঝ ফুটিয়ে বলেছে, "সে আপনি বুঝবেন না। চাচাজী হলে বুঝত।"

এ কথায় বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছি। বলেছি, "তোমার চাচাজী অনেক বড় গোয়েন্দা হতে পারে কিন্তু সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিও কি আমার নেই। একটা মানুষকে কেন অকারণে অত ঘৃণা কর তাও আমি বললে বুঝব না? ওর বাবা যদি কিছু অন্যায় করেও থাকে তার জন্যে ওকে অচ্ছুৎ করে রাখা কেন?"

শমিতা হঠাৎ চমকে আমার দিকে মুখে ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখচোখ তার রাঙা হয়ে উঠেছে, রাগে, বিরক্তিতে, উত্তেজনায়।

"ঐসব কথা ও আপনাকে বলেছে বুঝি?" ঝংকার দিয়ে উঠেছে শমিতা, "তাই গুজ গুজ ফুস ফুস করতে গিয়েছিল আপনার কামরায়! বেশ ওর কথাই বিশ্বাস করবেন।"

এবার হেসে ফেলে বলেছি, "রেগে তো যাচ্ছ কিন্তু নির্মলের কথা কেন বিশ্বাস করব না তা তো বলছ না।"

"সে বাবার কাছে শুনবেন।" বলে শমিতা দূরে একটা ঝিনুকের ডগা বালির ওপর উঠে আছে দেখে সেদিকে ছুটে গেছে।

তার অত উৎসাহভরে ছুটে যাওয়াই বৃথা হয়েছে অবশ্য। আমি কাছে গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছি তখন সে তীরের ওপরই উবু হয়ে বসে পড়ে আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ে ঝিনুকটা তুলেছে। ঝিনুকটা আমাকে দেখিয়ে করুণ মুখে বলেছে, "দেখছেন এত সুন্দর ঝিনুকটা আধখানা ভাঙা।"

www.boiRboi.blogspot.com

তার মেজাজের ক্ষণে ক্ষণে মেঘরৌদ্রের খেলা দেখে কৌতুকই বোধ করছি। এবার তার হাত ধরে টেনে তুলে বলেছি, "চল হোটেলে ফিরে যেতে হবে। ভিজে কাপড়ে আর থাকা চলবে না।"

ভালো ভালো কত ঝিনুক এখনও খুঁজলে পেতে পারে বলে শমিতা প্রথম একটু মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কথার অবাধ্য হয়নি।

নির্মল বেচারার বরাৎ-ই খারাপ। হোটেলের পথে যেতে যেতে আবার তার সঙ্গে দেখা।

সেখানে দাঁড়িয়ে একটা নুলিয়া বুড়ীর চুবড়িতে সে ঝিনুক দেখছিল। নুলিয়া বুড়ীটা নানারকমের ঝিনুক বড় বড় হোটেলের সামনে এইরকম বিক্রী করতে আসত তখন। তাদের কাছে একটু ভাল ভাল বিরল গোছের ঝিনুকও থাকে।

নির্মল আমাদের দূর থেকে দেখেই যেন বাঘ-ভাল্লুক দেখার মত ভয় পেয়ে বুড়ীর ঝুড়ি বালিতে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে হোটেলের দিকে পালাতে গিয়েছিল।

কিন্তু নাছোড়বান্দা বুড়ীর জন্যে তার যাওয়া হলো না।

"হেই সায়েব দুটো পয়সা দিয়ে যা। নইলে বুড়ী খেতে পাবে না।" তার নিজের ভাষায় বলে বুড়ীটা নড়বড়ে পায়ে নির্মলের পেছনে ছুটে প্রায় এমন আর্তনাদ করে উঠল যে ফিরে না দাঁড়িয়ে নির্মলের উপায় রইল না।

পাশ দিয়ে যাবার সময় নির্মল তো বুড়ীর চুবড়ির ওপর এমন মুখ গুঁজে রইল যেন আমাদের দেখতে না পাওয়াটা স্বাভাবিক মনে হয়।

শমিতা তো আগে থাকতেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটছে।

আমি তো আর শমিতাকে অনুকরণ করতে পারি না। পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু হেসে ভদ্রতার খাতিরে বললাম, "ঝিনুকের শখ আছে বুঝি?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে মুখ তুলে নির্মল কুণ্ঠিত ভাবে হেসে

www.boiRboi.blogspot.com

বললে, "না, শখ এমন কিছু নয়। তবে খুব নতুন ধরনের দু' একটা ঝিনুক বুড়ীর কাছে দেখছি।"

একটা সে ঝুড়ি থেকে তুলে আমার হাতেই দিল।

ঝিনুক সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু পুরীর সমুদ্রতীরে সাধারণত যে ধরনের ঝিনুক চোখে পড়ে তা থেকে এটা যে বেশ আলাদা তা বুঝতে আমারও কষ্ট হল না।

শমিতা তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেহাৎ হাতটা তার ধরে রেখেছি বলেই চলে যেতে পারেনি।

ঝিনুক সম্বন্ধে তার কি প্রচণ্ড আগ্রহ তা জেনে তাকে ডেকে বললাম, "ঝিনুকটা একবার দেখো শমিতা, ভারী অদ্ভুত।"

ভেবেছিলাম ছেলেমানুষী রাগে বোধহয় মুখ ফেরাতেই চাইবে না, কিন্তু ঝিনুকের লোভ কাটানো শক্ত।

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মুখ ফিরিয়ে শমিতা ঝিনুকটা দেখল তারপর আমার হাত থেকে সেটা নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে তার মুখচোখ নিজের অজান্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখলাম। আমার দিকে ফিরে কিন্তু আবার গম্ভীর হয়ে সে বললে, "এ ঝিনুকটা আমি কিনব।"

নুলিয়া বুড়ী কথাটা বুঝে তাড়াতাড়ি বললে, "ওটা তো বেচতে পারব না, ওটা এই সাব নিয়ে নিয়েছে।"

নুলিয়া বুড়ী আঙুল দিয়ে নির্মলকে দেখিয়ে দিলে।

এক মুহূর্তেই আষাঢ়ের মেঘ হয়ে উঠল শমিতার মুখ। নুলিয়া বুড়ীর অঙ্গুলিনির্দেশ সত্ত্বেও নির্মলের দিকে দৃষ্টিপাত না করে সে তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বললে, "নিয়ে নিয়েছে কিসে? দাম দিয়েছে তোমাকে?"

বুড়ী শমিতার অগ্নিমূর্তি দেখে আর কড়া গলা শুনে ভয়ে ভয়ে যা বললে, তার মর্ম এই যে, সায়েব দাম দেয়নি তবে নেবার কথা তার সঙ্গে হয়ে গেছে।

"তাতে মাল কেনা হয়ে যায় না।" শমিতা গরম মেজাজে বললে,

www.boiRboi.blogspot.com

"দাম দেওয়া না হলে আবার বিক্রী কিসের? শুধু ঐ ঝিনুকটাই নয় তোমার সমস্ত চুবড়িই আমি কিনে নেব। বল কত দাম?"

আমি যদি হতভম্ব হয়ে থাকি বুড়ী ত তখন একেবারে দিশাহারা। কাঁদ কাঁদ হয়ে মিনতি জানাল যে, সে গরীব মানুষ, সায়েব দিদিরা ঝগড়া করে তার লোকসান যেন না করে।

"না লোকসান তোমার হবে না।" শমিতা কড়া গলায় আশ্বাস দিয়ে বললে, "কত দাম ঝুড়ির জন্যে তুমি চাও বল। এক টাকা? দু'টাকা? আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দেব।"

বুড়ীর অবস্থা তখন দেখবার মত। আহ্লাদে আটখানা হতে গিয়েও যেন চোখে অন্ধকার দেখছে।

কাতরভাবে একবার নির্মল একবার শমিতার দিকে ফিরে বললে, "তোমরা আমার মা বাপ। ঝগড়া না করে আপসে যে চাও আমার চুবড়ি নিয়ে নাও। পাঁচ টাকা, দশ টাকা নয়, দুটো টাকা পেলেই আমি খুশি।"

"না, পাঁচ টাকাই তুমি পাবে।" শমিতা অটল তার সঙ্কল্পে, "ঝুড়ি নিয়ে এস আমার সঙ্গে।"

শমিতা তাদের কটেজে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ নির্মলের অস্বাভাবিক গলার স্বরে তাকে একটু চমকেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। চমকে উঠলাম আমিও।

"ঝুড়ি নিয়ে তুমি যেতে পার।" নির্মল নুলিয়া বুড়ীকে বলছে, "কিন্তু ঐ ঝিনুকটা রেখে যাও। ওটা আমি নিয়েছি, ওটার দাম আমি-ই দেব।"

নির্মলের কথাগুলো আর বজ্রকঠিন স্বরে তা বলার ধরনে আমিও তখন অবাক। আর হঠাৎ এ রকম শক্ত হয়ে ওঠাটা সত্যিই বেশ অস্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হওয়ার বদলে তার ওপর সহানুভূতিই বোধ করেছি। বেচারা অনেক সয়ে শেষে অতিষ্ঠ হয়ে এমন ফোঁস করে উঠেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু আমি একজন বয়স্ক গুরুজন স্থানীয় লোক হয়ে এই ছেলেমানুষী রেষারেষির ঝগড়ার তো প্রশ্রয় দিতে পারি না। নির্মল ও শমিতা দুজনেই তখন আগুন হয়ে উঠেছে। কেউ কারুর দিকে না চেয়ে নুলিয়া বুড়ীকে অনুনয় বিনয় থেকে শাসানি পর্যন্ত দিচ্ছে ঝিনুকের চুবড়ি বিক্রী করবার জন্যে। নুলিয়া বুড়ীর অবস্থাই তার মধ্যে একেবারে শোচনীয়।

শমিতা ঝুড়ির দামটা তখন পাঁচ থেকে দশে উঠিয়েছে আর নির্মল তার এক গোঁ ধরে বসে আছে যে, ঝুড়ির ঐ একটা ঝিনুক সে নিজে কিনবে।

একটু চোখ রাঙাবার ভান করেই এবার বলতে হল, "তোমরা কি পাঁচ বছরের খোকাখুকী! লজ্জা করে না এ রকম ভাবে পথে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে! যে ঝিনুকের চুবড়ি নিয়ে ঝগড়া তা তোমাদের দুজনের কেউ নয়, আমিই কিনব। আয় বুড়ী, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলি তোর ভাগ্যে দশটা টাকা নাচছে।"

মুখ গোমড়া করলেও আমার এ কথার প্রতিবাদ কেউ করলে না। নির্মল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এতক্ষণে একবার শুধু শমিতার দিকে তাকিয়ে তার হাতের ঝিনুকটা বুড়ীর চুবড়ির ভেতরে ফেলে হন্ হন্ করে হোটেলের ভেতরে চলে গেল।

শমিতা মুখখানা হাঁড়ির মত করে মাথা নামিয়ে আমার সঙ্গে যেতে যেতে বিজবিজ করে প্রায় নিজের মনেই যা বললে তার এইটুকুই মর্ম বুঝলাম—"যাই হোক ওকে তো কিনতে দিইনি!" কথাটা শুনেও বুঝতে না পারার ভান করে করে চুপ করে রইলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

সেই দিনই দুপুরবেলা পরাশর পুরীতে ফিরে এল। ফিরে এসে প্রায় নাটকীয় মুহূর্তেই দেখা দিল বলা যেতে পারে। সেদিনটার অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারটার পর আদমজির কাছে আমার যা বলার তা আর চেপে রাখা উচিত মনে হয় নি।

সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া চোকবার পর আদমজিকে তাই আমি আমার কামরাতেই অনুরোধ করে ডেকে আনিয়েছি। শমিতা তখন তার নিজের কটেজের কামরায় শুতে গেছে। নির্মলকে তো সেই দুপুর থেকেই হোটেলে আর কোথাও দেখিনি। মনের ঘেন্নায় হোটেল ছেড়েই যদি সে চলে গিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আদমজির বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবেই আমার সমস্ত বক্তব্য জানালাম।

প্রথমেই অভিযোগ জানালাম এই, যে তিনি আমাদের কাছে কথা লুকিয়েছেন।

আদমজির মুখটা কালো হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর নিজেকে সামলে একটু শুকনো স্বরেই তিনি বললেন, "সব কথা সকলকে জানাবার নয়।"

আমার মেজাজও তখন খুব প্রসন্ন নয়। কঠিন স্বরেই বললাম, "কিন্তু আমাদের জানানো না জানানোর ওপর আপনার মেয়ের সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আপনার ভুলে বা দোষে শমিতার মনটা কি ভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে তা জানেন?"

কোনারকের সেই বালিয়াড়ীর ধারের রহস্যজনক পদচিহ্নের কথাই এবার বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটা

www.boiRboi.blogspot.com

কথা জানানো দরকার বলে নিজেকে সামলে নির্মল কাজারিয়ার সঙ্গে তাঁদের শত্রুতার কথা তুলে সকালের ঘটনাটা জানিয়েছি।

বলেছি, "ঐটুকু মেয়ের মন কি ভাবে বিষিয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছেন? ঐ বয়সের ছেলেমেয়ে যাদের মধ্যে ভালবাসা এমন কি বিয়ে হওয়াও অসম্ভব ছিল না তারা একজন আর একজনকে ঐ রকম ঘৃণা···।"

"নির্মলের সঙ্গে শমিতার বিয়ে!" আদমজি তাঁর মনের বিদ্বেষ যেন আর চেপে রাখতে পারলেন না, "তার চেয়ে শমিতার জলে ডুবে মরা ভাল।"

"কেন!" সত্যিই বিমূঢ় বিস্ময়ে বললাম, "নির্মল এমন কি অপাত্র? সে কি সাংঘাতিক কিছু? আপনার সঙ্গে পার্টনার-শিপের কারবার সে ভেঙে দিতে চায় না এই তো তার অপরাধ?"

"ঐ তার অপরাধ?" জ্বলে উঠেছেন আদমজি, "ও কতবড় শয়তানি মতলবে ফিরছে আপনি কি বুঝবেন?"

"একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টাই করুন না।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম।

"না, বুঝতে আপনি পারবেন না।" আদমজি তিক্ত স্বরে বললেন, "তবু একটা ছুটো নিয়ে ভাবতে পারেন, যেমন—এত জায়গা থাকতে ও এই পুরীতে এসে বি. এন. আর. হোটেলেই এসে উঠেছে কেন?"

এবার আমি না হেসে উঠে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কতদিন আগে আপনার কটেজ বুক করেছেন?"

"সেই তো কলকাতা থাকতেই, মাস দু'য়েক আগে।" আদমজি এরকম অবাস্তব প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে বললেন, "আপনারা তো তা জানেন।"

"তা জানি।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আর এখানে নির্মলের পরিচয় জানবার পর আমি গোপনে হোটেলের রেজিস্ট্রারে

www.boiRboi.blogspot.com

খোঁজ করেছি। নির্মল ছ'মাস আগে এই সময়ের জন্যে হোটেলের কামরা বুক করেছে। ও-ই বরং ভাবতে পারে যে, আপনি কোন মতলব নিয়ে ওর ওপর নজর রাখতে এখানে এসে উঠেছেন।"

অপ্রত্যাশিত এ খবরে একটু বিস্মিত হয়ে আদমজি চুপ করে রইলেন।

আমিই আবার বললাম, "নির্মলকে যদি অপাত্র মনে করেন তবে তার সঙ্গে শমিতার বিয়ের কথা মনেও ঠাঁই দেবার দরকার নেই। কিন্তু শমিতার মনটা আপনার নিজের গোটাকতক ধোঁয়াটে ধারণা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দিয়ে তার কি ক্ষতি করছেন তা জানেন? শমিতা হয়তো সত্যিই খানিকটা Psychic! তার ওপর আপনার এই সব ধারণা কুসংস্কারের প্রভাবে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে না।"

"শমিতাকে Psychic কেন বলেছেন?" এবার আদমজির মুখে সত্যিকার উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

কোনারকের ঘটনাটা এবার না বলে পারলাম না।

বালিয়াড়ীর ওধারে সেই আশ্চর্য ভাবে মিলিয়ে যাওয়া পায়ের ছাপের কথা বলছি এমন সময় পরাশর আচমকা আমার কামরায় এসে ঢুকল।

"সে কি! তুমি কখন এলে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"এই খানিকক্ষণ আগেই এসেছি।" পরাশর আমার পাশেই সেটিটার ওপর বসে পড়ে বলল, "সবচেয়ে যা জরুরী ছিল সেটা সেরে তোমার কামরায় এলাম। ঠিক সময়েই এসেছি মনে হচ্ছে। আদমজিকে এই মুহূর্তেই বালিয়াড়ীর ভূতুড়ে পায়ের ছাপের কথা বলা দরকার ছিল।"

সত্যিই একটু ধোঁকায় পড়ে বললাম, "তোমার কথাগুলো বেশ সোজা, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা হেঁয়ালি চাপা আছে মনে হচ্ছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"চাপা হেঁয়ালিটা তাহলে খুলে দিই।" পরাশর হেসে বললে, "বালিয়াড়ীর ভূতুড়ে পায়ের ছাপের রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে।"

"মীমাংসা হয়ে গেছে?" আমি আর আদমজি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ, শুধু বালিয়াড়ীর ভূতের নয়, কোনারকের ক্যাম্পের সেই ঘুমের ওষুধের আর গরুর গাড়ির উধাও হয়ে যাওয়ারও।" পরাশর মৃদু মৃদু হেসে আমাদের হতভম্ব ভাবটা উপভোগ করছে মনে হল।

ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভূতুড়ে পায়ের ছাপটা কিসের? কার?"

"যার পায়ের ছাপ তাকে হোটেলের লরীতেই বসিয়ে রেখে এসেছি।" পরাশর এবার মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করে বললে—"একা অবশ্য নয়। গেলেই দেখতে পাব। আসুন আদমজি!"

বেশ একটু হতভম্ব হয়ে আদমজির সঙ্গে পরাশরের কথামত উঠতে যাচ্ছিলাম।

আবার বসতে হল।

করিডরে কার পায়ের শব্দ পেলাম। তার পরমুহূর্তেই 'আসতে পারি?' বলে যে দরজায় এসে দাঁড়াল সে অন্ততঃ সেই সময়টায় আমার ঘরে আসবে ভাবতে পারিনি।

আগন্তুক নির্মল কাজারিয়া। গলার স্বর যেমন তেমনি মুখের চেহারাও তার অত্যন্ত ভার ভার। হাতে তার কি একটা বড় লেফাফা গোছের।

'আসতে পারি'-র উত্তরে কেউ কিছু অভ্যর্থনা না জানালেও সে গট গট করে ভেতরে ঢুকে এসে আদমজির কাছেই দাঁড়াল। তারপর অত্যন্ত রস-কষহীন গলায় যেন মুখস্থ পড়ার মত বলে গেল,—"আপনাকে আপনার কেবিনে খুঁজতে গেছলাম। সেখানে শুনলাম আপনি মিঃ ভদ্রের সঙ্গে তাঁর কামরায় এসেছেন তাই এখানে এসে আপনাদের বিরক্ত করতে হল। মাপ করবেন।"

www.boiRboi.blogspot.com

একটু থেমে সামনের টেবিলের ওপর লেফাফাটা রেখে দিয়ে সে আবার তেমনি নীরস কণ্ঠে বললে,—"এই নিন, কোম্পানীর পার্টনারশিপ ভেঙে দিতে রাজী হওয়ার চিঠি আমি নিজে থেকে সই করে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম। আর কোনোদিন আমার জন্যে আপনাকে জ্বালাতন হতে হবে না।"

কথাগুলো বলেই গট গট করে নির্মল দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

দু এক মুহূর্ত কেমন হতভম্ব হয়ে থেকে আদমজি সোফা থেকে উঠে পড়ে ডাকলেন—"নির্মল! নির্মল শোনো!"

আর কোথায় নির্মল!

আমি তাড়াতাড়ি করিডরে বেরিয়ে তাকে দেখতেই পেলাম না। ততক্ষণে সে হোটেল থেকেই বেরিয়ে গেছে বোধহয়।

ফিরে এসে আদমজিকে অতটা বিচলিত দেখব ভাবতে পারি নি। তিনি যেন দারুণ একটা ঘা খেয়ে ভেঙে পড়েছেন।

পরাশর তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললে, "চলুন আদমজি! সেই কোনারকের রহস্যের কিনারার জন্যে লবিতে সব কিছুর যারা মূল তাদের বসিয়ে এসেছি যে!"

আদমজির তবু কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

মনমরা ভাবে বললেন,—"আমি আর গিয়ে কি করব। অপরাধীদের ধরেছেন যখন তাদের যা ব্যবস্থা করবার করুন। তেমন তেমন বোঝেন পুলিশে দিন!"

"পুলিশে দেব!"—পরাশরকে বেশ একটু ভাবিত মনে হল,—"পুলিশে দেওয়া একটু শক্ত হবে বোধহয়। কিন্তু আপনি হঠাৎ অত ভেঙে পড়লেন কেন? নির্মল কাজারিয়া আপনি যা চেয়েছিলেন তাই ত করে গেল। পার্টনারশিপ ভেঙে দেওয়াই ত আপনি চেয়েছিলেন। তা দিতে রাজী হচ্ছিল না বলেই ত আপনার ওর ওপর রাগ!"

আদমজী খানিক মনের দুঃখে উত্তরই দিতে পারলেন না।

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর গভীর অনুশোচনার সঙ্গে বললেন,—"হ্যাঁ, দোষ আমারই। আমি সত্যিই অবুঝ আহাম্মক। শুধু নিজের একটা ভীমরতির বয়সের জেদের জন্যে অমন একটা ছেলেকে হারালাম "

"এ তো বড় মজার ব্যাপার দেখছি আদমজি!" পরাশর কৌতুকের কারণটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "খানিক আগে যে আপনার চক্ষুশূল ছিল তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আপনি দারুণ লোকসান বলে মনে করছেন?"

"লোকসান ত নিশ্চয়ই!" আদমজি আফসোসের সঙ্গে বললেন, —"অমন ছেলে কটা পাওয়া যায়। কতবার মিটমাট করে ওকে কাছে ডেকে নেব ভেবেও মানের দায়ে আর বুড়ো বয়সের গোঁ-তে পারিনি।"

"আর নিজের মেয়ের মনটাও তাই এমন অন্যায় করে বিষিয়ে দিয়েছেন।"—আমি তিক্ত মন্তব্যটা না করে পারলাম না।

আদমজি অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে কি বলতে যাচ্ছিলেন, পরাশর তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, "নির্মলের সঙ্গে বোঝাপড়ার এখনো কোনো উপায় থাকলে আপনি বোধহয় খুশি হতেন আদমজি! তাই না?"

"হতাম, কিন্তু তার উপায় কই?"—আদমজি উঠে পড়ে হতাশভাবে বললেন,—"চলুন, লবিতেই যাই।"

"হ্যাঁ চলুন।" পরাশর আমার সঙ্গে উঠে পড়ে যেন কি একটা মনে পড়ায় বললে,—"আমি শুধু দেখছি শমিতার বুদ্ধি আপনার চেয়ে অনেক পাকা।"

কন্যাগর্বে গর্বিত হলেও কথাটার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে আদমজি এতক্ষণে একটু হেসে বললেন,—"কি করে বুঝলেন বলুন ত?"

"বুঝলাম"—পরাশর প্রশংসার সুরে বললে, "শমিতা বরাবর

www.boiRboi.blogspot.com

নির্মলকে ঠিক চিনেছে আর আপনাদের মিথ্যে ঝগড়া যাতে মিটে যায় প্রাণপণ তার চেষ্টা করে আসছে বলে।"

"শমিতা মিটমাটের চেষ্টা করছে!" আদমজির মত আমিও অবাক হলাম।

"হ্যাঁ, সেই তো করছে।" পরাশর হেসে বললে,—"এই পুরীতে আসা, কোনারকে যাওয়া সবকিছুর সে-ই ত আপনাকে দিয়ে আয়োজন করিয়েছে এইজন্যেই।"

"কি বলছেন তার মানেই ত বুঝতে পারছি না।" আদমজি স্পষ্ট সংশয়ের সুরে বললেন।

"চলুন, মানেটা চাক্ষুষ দেখেই বুঝবেন।" বলে পরাশর আমাদের আগেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

নিচে নেমে লবিতে মানেটা চাক্ষুষ দেখলাম, সেই সঙ্গে সঙ্গে কোনারক রহস্যের মূলাধারদেরও।

দুই-ই এক।

নিচের লবির একটি কোণে নির্মল আর তার পাশে শমিতা মাথা নিচু করে বসে আছে। আমাদের সঙ্গে আদমজিকে দেখে দুজনেই লজ্জালজ্জা মুখ করে দাঁড়িয়ে উঠল।

আদমজি কাছে আসবার পর নির্মল নিচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে,—"আমাকে মাপ করুন চাচাজি!"

শমিতাও তখন আদমজির পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে,—"আমাকেও মাপ করুন পিতাজি।"

আদমজি তখন নির্মলকে পিঠ চাপড়ে আদর করছেন। অবাক হয়ে একবার নির্মল আর একবার মেয়ের দিকে ফিরে বললেন,—"এতে মাপ করাকরির কি হয়েছে?"

"আমি আপনার সঙ্গে চালাকি করেছি চাচাজি! বললে নির্মল।

www.boiRboi.blogspot.com

"আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছি পিতাজি!" বললে শমিতা।

তাদের হয়ে পরাশরই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলে। নির্মলকে দেখিয়ে বললে,—"এই হল কোনারকের বালিয়াড়ীর ভূত। তবে বালির ওপর দাগটা ওর নয়, একটা বানানো কাঠের পায়ের। আগের দিনই ওখানে ছাপগুলো ওই ভাবে দিয়ে রেখে এসেছিল। অল্প ভিজে আঁট মিহি বালি বলে ছাপগুলো একদিনে নষ্ট হয়নি। পরের দিন যেন সত্য কেউ ফেলেছে বলে মনে হয়েছে! ওইটেই ছিল কারসাজি। আর তাতে সাহায্য দরকার হয়েছে শমিতার মত যোগ্য অ্যাসিসট্যান্টের। শমিতা যেন তৎক্ষণাৎ কাকে ওই ঢিবির আড়ালে সরে যেতে দেখেছে বলে রহস্যটাকে অলৌকিক করে তুলেছে। একটা লোককে দেখা গেল, তার পায়ের দাগও পাওয়া গেল ঢিবির আড়ালে। লোকটা তাহলে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কি করে? এই সব ভেবেই যাতে আমরা ভয় পাই তাইজন্যে অত আয়োজন। গরুর গাড়ি হঠাৎ উল্টো দিকে বিনা গাড়োয়ানে নিজে নিজে চলে যাওয়াও তাই। সে কাজও এই নির্মলের। আমাদের অন্য চাকর চেনাজানা রাঁধুনী আর তার যোগাড়দার নেওয়া হয়েছিল বাইরে থেকে। নির্মল দাড়ি গোঁফ রেখে ময়লা কাপড় জামায় যোগাড়ে সেজে রাঁধুনীর সঙ্গে আমাদের ক্যাম্পে থাকে। কুক-এর সঙ্গে আগে থাকতেই তার ব্যবস্থা ছিল। ঘুমের ওষুধ সেদিন রাত্রের খাবারে নয় খাবার জলে সেই মিশিয়েছিল। মিশিয়েছিল অতি সামান্যই। কলকাতায় জলের স্যাম্পল নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আমি জেনেছি। কিন্তু সারাদিন খেটে-খুটে যারা ক্লান্ত তাদের ওই সামান্যতেই কাজ হয়েছে। তারা যখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে তখন নির্মল গাড়ি জুতে উল্টো দিকে চালিয়েছে। গাড়ি ছাড়বার আগে শমিতা তার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। তাই সমস্ত ব্যাপারটা

ঠিক জানে না। কিছু কিছু আন্দাজ করে। সে শমিতার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে যখন তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখন তুমি কৃত্তিবাস গিয়ে তাকে দেখো। আমি তার আগেই গরুর গাড়ির আওয়াজ পেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে শমিতা আর নির্মলকে কথা বলতেই দেখে আসি। নির্মল ফেরবার সময় আমাদের সঙ্গেই আসে কিন্তু পুরীর কাছাকাছি এসে আগের বন্দোবস্ত মত রাঁধুনীর সঙ্গে ঝগড়ার ছল করে চলে যায়। এখানে এসে সে কৃত্তিবাসের সঙ্গে মিছিমিছি গগল্‌স কুড়িয়ে পাওয়ার নাম করে ভাব করে অনেক কথা তাকে জানায়, শমিতার সঙ্গে একটা দারুণ ঝগড়ার অভিনয়ও করে।

পরাশর একটু থামতে আদমজি খুশিমুখে বললেন,—"এত সব করেছে কেন? শমিতার ওপর কোনো অপদেবতার কোপ আছে মনে করে আমি যাতে ভয় পাই তাই?"

"হ্যাঁ!" পরাশর হেসে সায় দিয়ে বললে,—"ছেলেমানুষী মতলবটা ছিল ওই রকম। এই রকম আর একটা দুটো অলৌকিক ঘটনার পর শমিতা যেন অপদেবতার ভর হয়ে বিছানা নিয়ে প্রলাপ বকবে, আর সেই প্রলাপে অপদেবতা যেন আপনাকে ভুল ধারণা ছেড়ে নির্মলের সঙ্গে সব ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে আদেশ দেবে।"

আদমজির সঙ্গে আমরা সকলেই এবার হেসে উঠলাম। শমিতা লজ্জা পেয়ে একটু অভিমান ভরে বললে, "আমার বুদ্ধি কম তা আমি কী করব। আমি ত ভালো ভেবেই করেছি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—তুমি ঠিক করেছ বেটী!" আদমজি শমিতার পিঠ চাপড়ে বললেন, "যাক্ অপদেবতার হুকুম পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হয়নি এই ভাগ্যি। মিঃ বর্মাই তার আগে সব সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁকে বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া।"

"আমি কি অপদেবতার ধন্যবাদগুলোই পেলাম?"

পরাশরের কথায় আবার সবাই হেসে উঠলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

পরাশরকে তারপর এক সময়ে একলা পেয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারিনি।

পরাশর কচ্ছের আধা মরু সমুদ্রতীরের একটা গল্প বলেছিল আর আদমজিও একটা গল্প বলেছিলেন রাজপুতানার উত্তরের মরুর। এ দুটো গল্পের কোনোটাই পুরো সত্য বলে মনে হয়নি। সেগুলোর সঙ্গে বর্তমান ঘটনাগুলোর সম্বন্ধ আছে কি না জানতে চেয়েছিলাম।

"সম্বন্ধ আছে শুধু এই," পরাশর বুঝিয়ে বলেছিল যে, "ও দুটো গল্পই আদমজির আদি জীবনের। ও দুটোই অর্ধেক সত্য। ও দুটো জুড়লে তবে যথার্থ ইতিহাসটা পাওয়া যায়।"

"কি রকম?" জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"আমার গল্পটার গোড়াটা সত্য।" বলেছিল পরাশর। "কিন্তু নায়ক আমি নই, আদমজি। আর জায়গাটা কচ্ছের তীরভূমি নয়, রাজপুতানার পশ্চিমের মরু প্রান্তর। আদমজির গল্পের শেষটা সত্যি কিন্তু পুরোপুরি নয়। আমি নিজের নাম করে যা বলেছি আদমজি সেইভাবে দুই সর্দারের লড়াই-এর সুযোগে পালিয়ে যান কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান শুধু আয়িকে নয় আয়ি যার পরিচারিকা ও পাহারাদারনী ছিল সেই মেয়েটিকেও। দ্বিতীয় সর্দার এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করে। সেই তাঁকে সভ্য সমাজে পৌঁছে দিয়ে তাঁর সঙ্গে মেয়েটির বিয়েও দেয়। সেই মেয়েই হল শমিতার মা আর সেই দ্বিতায় সর্দার হল নির্মলের বাবা যিনি নাম ভাঁড়িয়ে মুখরাম নাম নেন বোম্বেতে। প্রথম সর্দার প্রাতশোধ নিতে আসতে পারে এই ভয় অনেকদিন আদমজির মনে ছিল। নির্মলের বাবা—মুখরাম কাজারিয়া তাতে তাঁকে সাহস দিয়েছেন। মুখরামের সঙ্গে আদমজির শেষকালে মনান্তর হয় শমিতার কথা নিয়েই। শমিতা নির্মল দু'জনেই তখন ছোট কিন্তু পরে নির্মলের সঙ্গে শমিতার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আদমজি মুখরামকে জানিয়েছিলেন। মুখরাম

www.boiRboi.blogspot.com

এককালের আধা ডাকু বেলুচি সদাগর হলেও অত্যন্ত গোঁড়া। জাতের অভিমান ছিল তাঁর অত্যন্ত বেশী। আদমজির সঙ্গে যাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রতি যত স্নেহই থাক তার পেটের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের কথাটাকে আমল দেননি। পরে হয়ত তাঁর মত বদলাত। কিন্তু তার আগেই তিনি মারা যান। এই হল আদমজির আদি ইতিহাস।"

সমস্ত শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ গল্প হঠাৎ সেদিন তুমি কোনারকে বলেছিলে কেন?"

"শমিতা তার মায়ের আদি ইতিহাস কিছু জানে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে। আদমজি তাকে সে সব কিছু জানতে দেন নি প্রমাণ পেয়ে খুশি হয়েছিলাম।"

একটু থেমে পরাশর হেসে বলেছিল, "কিন্তু তোমার ভাবগতিকটা কি বলো ত? নির্মল শমিতার বিয়েতে বরযাত্রী না কন্যাযাত্রী হবে যেন ঠিক করতে পারছ না মনে হচ্ছে।"

হেসে বলেছিলাম, "সত্যিই তা পারছি না।"

শেষ